ফেব্রুয়ারি ২০২২ ▪ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৮

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

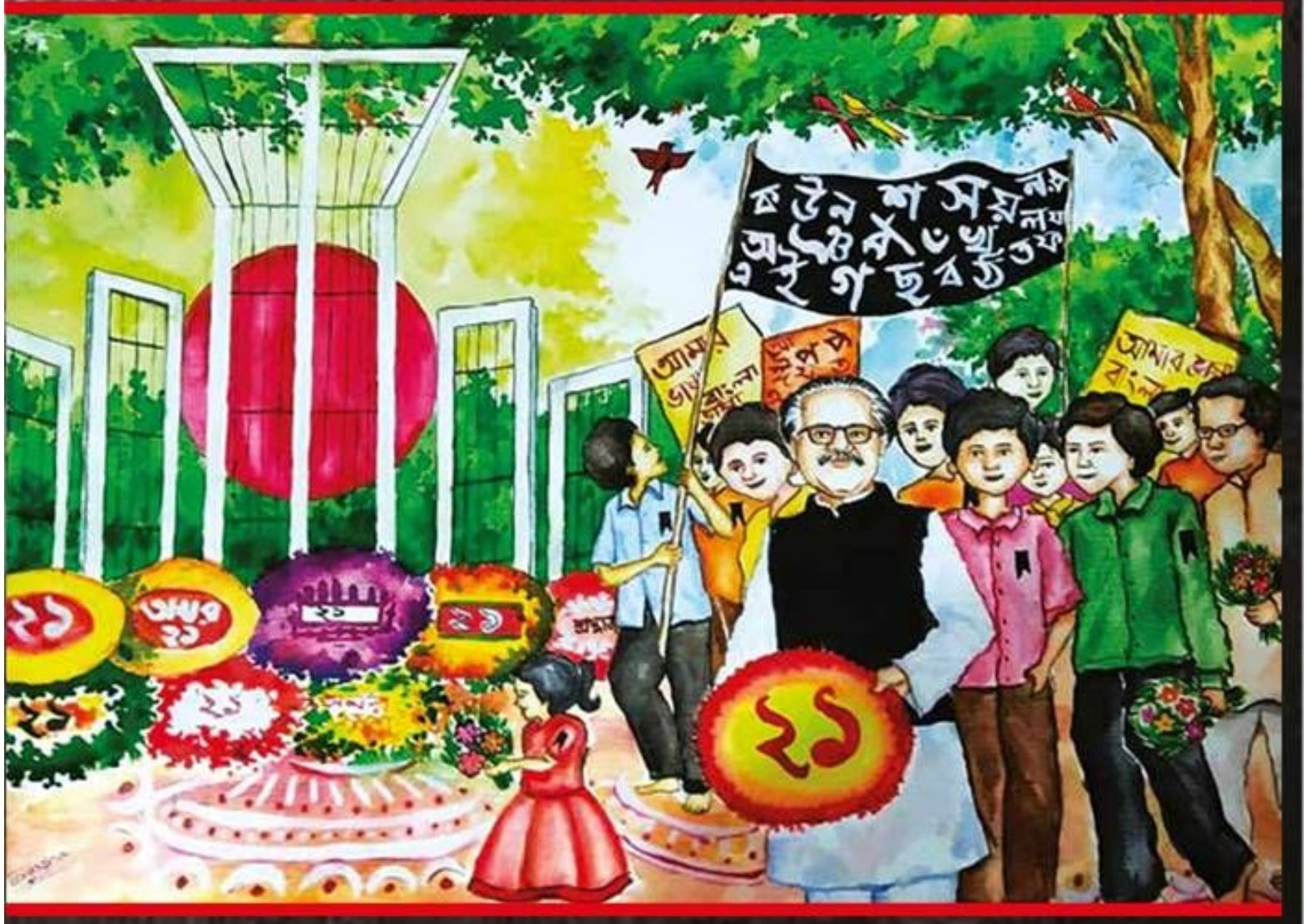

একুশের কথামালা

কাজলের প্রভাতফেরি

মাইশা বিনতে মাহমুদ, অষ্টম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ, ঢাকা

শারিকা তাসনিম নিধি, তৃতীয় শ্রেণি, চিলড্রেন একাডেমি, চাঁদপুর

সম্পাদকীয়

ফেব্রুয়ারি মাস, ভাষার মাস। এই মাসেই আমাদের মাতৃভাষা বাংলার ওপর চরম আঘাত করেছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। বায়ান্নতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি শুধু বাংলার মানুষের মুখে মুখেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এ সময়ে পূর্ব বাংলার সব শহরে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথে প্রাণ দেয় সালাম, রফিক, শফিক, বরকত, জব্বারসহ অসংখ্য ভাষা শহিদ। সেই দিনটি আজ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে সারা পৃথিবীতে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। প্রতিবছর এদিন আমরা শহিদমিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই ভাষা শহিদদের।

ছোট্ট বন্ধুরা, বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ভাষা আন্দোলন। নিজের ভাষায় কথা বলার, লিখতে পারার, গান গাইতে পারার স্বাধীনতার লড়াইয়ের নাম ভাষা আন্দোলন। তাই বলা হয়, একুশ মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত না করা। একুশ মানে বিজয়ের লক্ষ্যে আত্মত্যাগ। একুশ মানে শাসকের অপতৎপরতা প্রতিরোধ করার অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির মহিমার পথ ধরেই আজকের মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ।

বন্ধুরা, ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'সুবর্ণ জয়ন্তীর অঙ্গীকার, ডিজিটাল পাঠাগার'। আমরা চাই প্রত্যেকের ঘরে-স্কুলে-পাড়া-মহল্লায় বেশি বেশি গ্রন্থাগার গড়ে উঠুক। সর্বোপরি সবার মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠুক। ঘরে ঘরে সুন্দর মনের মানুষ গড়ে উঠুক।

বন্ধুরা, প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে অমর একুশে বইমেলা আনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটছে। বিশ্ব জুড়ে মহামারি কোভিড-১৯-এর কারণে এ মেলা এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্বল্প পরিসরে। তারপরেও আমরা খুশি! তাইনা ছোট্ট বন্ধুরা, কারণ অমর একুশে বইমেলা আমাদের প্রাণের মেলা, সবার মেলা। মেলা থেকে নতুন নতুন বই কিনব, বই পড়ার আনন্দে মেতে উঠব।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : প্রিয়াংকা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ৭৬/ই নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

নিবন্ধ

একুশের কথামালা/বিপুল বড়ুয়া ০৩
বিশ্বে বাংলা ভাষার চর্চা /ফারিন আহমেদ খান ১১
কৃষ্ণচূড়ার একুশ/কামাল হোসাইন ১২
কলমবন্ধু/ওবায়দুল মুন্সী ১৬
আবিষ্কার: বই/নুরে আলম সিদ্দিকী শান্ত ১৭
জ্ঞানের পৃথিবী/সারমিন ইসলাম রত্না ১৮
খুকি ও কাঠবিড়ালির সখ্য/পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য ৩৮
রাজধানী ঢাকার প্রথম পাঠাগার/ইফতেখার আলম ৪০
ঐতিহ্যের ঘোড়ার গাড়ী/মো. জাহেদুল ইসলাম ৫৩
বই নিয়ে কলেজের গেট/আরিয়ান খান ৫৫

গল্প

কাজলের প্রভাতফেরি/রফিকুর রশীদ ০৬
বর্ণমালা/নাহার আহমেদ ০৯
বইপ্রেমী টুটুল/আমিরুল হক ১৯
মাতৃভাষার মায়া/ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান ২১
প্রভাতফেরি/উৎপলকান্তি বড়ুয়া ২৪
বকুল সৌরভ/নাসিমুল বারী ২৬
ভাষ্য কেন স্যার হতে চায়/খাররুল বাবুই ৩৪
ভালো চাচা ও তিন পচার গপ্প/নাসরীন মুস্তাফা ৪৫

সাফল্য প্রতিবেদন

বিশ্বের মিষ্টি ভাষা বাংলা/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ১০
দৃষ্টিনন্দন শহীদ মিনার/মেজবাউল হক ৫৭
চার বছরে ২০ পদক/ জান্নাতে রোজী ৫৮
শিক্ষার্থীদের জন্য ইউনিক আইডি ৫৯
অদম্য তামান্না/সুলতানা বেগম ৬০
দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফফাত আখি ৬১
বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ ৬২

বড়োদের কবিতা

৪২ মঈনুল হক চৌধুরী/মো. জাহাঙ্গীর আলম
শাজাহান কবীর/জসীম মেহবুব
৪৩ খোরশেদ আলম নয়ন/রুহুল আমিন সজল
শাহরুবা চৌধুরী/
৪৪ মিজানুর রহমান মিথুন/আ. শ. ম. বাবর আলী/
সাবিত্রী রানী/শচীন্দ্র নাথ গাইন
৫০ আবু তৈয়ব মুছা/গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন

ছোটোদের ছড়া ও গল্প

৫১ সোয়ানুল ইসলাম/মো. আকিব হোসেন
নীতু ইসলাম/আরিয়ান আযওয়াত রোহিত)
৫২ ভাষা নিয়ে যুদ্ধ/শেহজাদী ফারহা অর্থি

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

৩০ রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তাফা মাসুদ

কার্টুন

৪৮ বই মেলায় লাড্ডু গুড্ডুর কাণ্ড কীর্তি/সত্যজিৎ বিশ্বাস

ছোটোদের আঁকা

প্রচ্ছদ : তিয়াশা সরকার
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : মাইশা বিনতে মাহমুদ/শারিকা তাসনিম নিধি
০৫ নাকীবাহ রুকায়াত নাসিম
১৫ ইরফান হোসাইন
২৯ তাসিন মুমস্বাদ
৩৭ রুকাইয়া রুকু
৩৯ সাকিব রহমান
৪১ সারিকা তাসনিম
৫৪ তাসদিদ তাবাসসুম আশফিয়া
৫৬ সাজেদা আক্তার
৬৪ সাদিয়া হক/সুজানা চৌধুরী স্নেহা

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

একুশের কথামালা

বিপুল বড়ুয়া

হুমায়ুন আজাদ তাঁর 'এক ফোঁটা চোখের জলের মতো শহিদমিনার'-এ লিখেছেন '...বায়ান্ন থেকে এই অশ্রুবিন্দুই হয়ে উঠেছে বাঙালির তীর্থ।...বাঙালি যখন প্রতিবাদ করতে চায় তখন যায় এই এক ফোঁটা চোখের জলের কাছে। বাঙালি যখন অধিকার চায়, তখন যায় এই অশ্রুবিন্দুর কাছে। বাঙালি যখন স্বাধীনতা চায়, তখন যায় এই চোখের জলের কাছে।...আবার এই অশ্রুই হয়ে ওঠে আগ্নেয়গিরি। শহিদমিনার : বাঙালির অশ্রুও আগুনে গড়া তীর্থ।'

এ তীর্থকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বাঙালির স্বাধিকার চেতনার মূল সুর। বাঙালি নিজেকে নিয়ে গভীরভাবে একান্তভাবে ভাবার অবকাশ পেয়েছে। ফিরে তাকায়নি তার দুঃস্বপ্নের আতঙ্ককে।

হাজার বছরের স্বাধীন বাক্ ভৌতভূমির বাংলাদেশ। ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীন হয়ে সেই ১৯৪৭-এ যে পাকিস্তানি উপনিবেশের করাল গ্রাসে ডুবে গেল, তা থেকে মুক্তির চেষ্টা করা হয়নি তা না। নানা দিক থেকে সে চেষ্টা হয়েছে অবিরত। কী রাজনৈতিক, কী আর্থ-সামাজিক, কী সাংস্কৃতিক এমনি সব ক্ষেত্রে বাঙালি উঠে পড়ে লেগেছিল সেই '৪৭ পরবর্তী সময়কাল থেকে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একগুঁয়েমি-স্বেচ্ছাচার কিংবা বিরূপ রাজনৈতিক কুটিলতা কাঁপিয়ে দেওয়ার হীন চেষ্টায় মাথা তুলে দাঁড়ানো হয়নি বাঙালির। এক্ষেত্রে বাঙালির চেতনাকে প্রচ্ছন্নভাবে হেলাফেলা করে তুমুল বিরোধিতা করে গেছে কিছু সুবিধালোভী মতলববাজ।

১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ। রেসকোর্স ময়দান-ঢাকা। পাকিস্তানের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্'র মুখে শোনা গেল বাঙালি বধ নিগ্রহের কূটচাল। উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা অন্য কিছু নয়। জিন্নাহ'র এ বক্তব্যের পিছনেও রয়েছে আরো কলকাঠি ঘোরানোর লোক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার

আগেভাগেই উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হবে এমনটি বলে বেড়াচ্ছিল তৎকালীন পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রথম সারির নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়া উদ্দিন আহমদ।

যে বক্তব্য-আলোচনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বাঙালির বিদগ্ধজন লেখক আবদুল হক, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক। আর জিন্নাহ'র বক্তব্যের প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল রেসকোর্সের বিক্ষুব্ধ জনতা আর গ্রাম-বাংলার সংগ্রামী জনতা। কার্জন হলে ছাত্র সমাবেশেও যখন ভাষার প্রশ্নে উর্দুকে বাঙালির রাষ্ট্রীয় জীবনে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন জিন্নাহ সেখানে ছাত্ররা প্রতিবাদমুখর হয়ে জিন্নাহ'র কথা ফিরিয়ে দেন। কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান গণপরিষদ অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাবনা করে জানান দেন বাঙালি বাংলার স্বাতন্ত্র স্বকীয়তাবোধকে।

যে উর্দু পশ্চিম পাকিস্তানের মাতৃভাষা, যেখানে রয়েছে অঞ্চল বিশেষে স্থানীয় ভাষার দাপট, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর একমাত্র ভাষা হাজার বছরের ইতিহাসসমৃদ্ধ বাংলা ভাষার প্রতি এ অবমাননাকর অবস্থান কে মেনে নেবে? বাঙালি মেনে নেবে? নেবে না-নেয়ওনি। বাঙালি তার মায়ের ভাষা বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা মানবে-অন্যথা নয়।

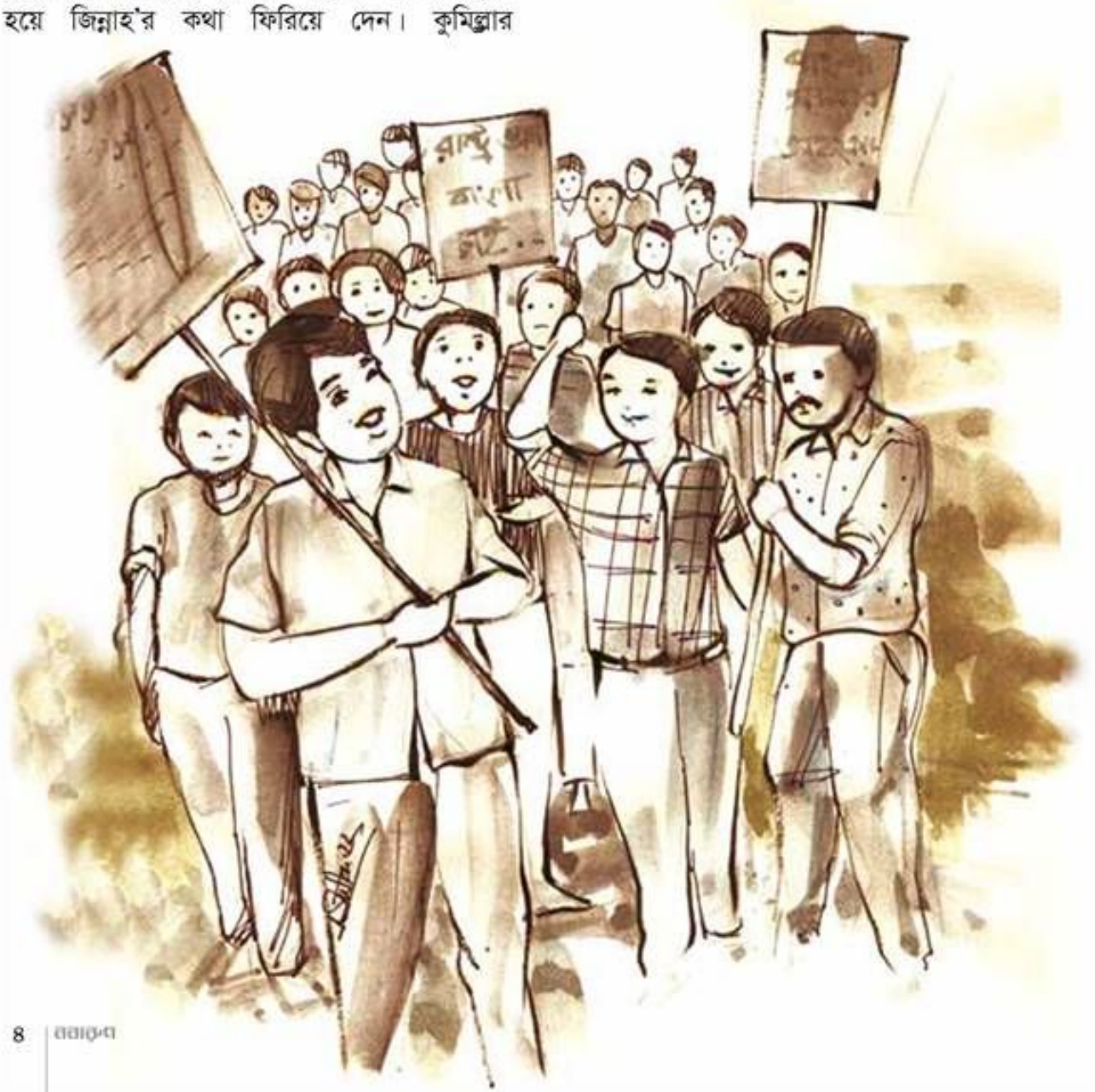

সেই '৪৮ হতে '৫২। তার পরের ইতিহাস সংগ্রামের-প্রতিবাদের ইতিহাস। রক্ত ঝরার ইতিহাস। জেগে ওঠার ইতিহাস। বাঙালির সেই সংগ্রামী চেতনার ইতিহাস। বাঙালির রাজপথে নেমে আসা। তার সূর্যসন্তানরা রক্তের বন্যায় হাসিমুখে নিজেকে উৎসর্গ করে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় সমাসীন করেছে।

'৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে প্রাণ উৎসর্গ করেছে সালাম, জব্বার, রফিক, শফিউর, আরো অনেক নাম না জানা অকুতোভয় সংগ্রামী বাঙালি। পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণের ভিতকে কাঁপিয়ে দেওয়া তাদের দুঃস্বপ্নের সিংহাসনকে তছনছ করে দেয়। ভাষার অধিকার ফিরে পাওয়ার পর বাঙালি নেমেছে স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে। পাক হায়না বাঙলা ছাড়-এ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পাকিস্তানি শাসন-শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে ফিরে দাঁড়িয়েছে বাংলা-বাঙালি।

জাতির বিবেক আবুল ফজল যেখানে বলেছেন, 'একুশ মানে মাথা নত না করা' সেখান হতে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি শুরু করেছে এক অন্যতম সংগ্রাম। ছাত্র আন্দোলন, গণআন্দোলন, ছয় দফা স্বাধীনতার এক দফা আন্দোলনের পথ বেয়ে বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা অর্জন' বিশ্বে বাঙালির একাগ্রতা অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠতার জাত চিনিয়েছে। স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর বাংলা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে।

বিশ্বসভায় বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আজ তার লাল-সবুজের পতাকা উড়িয়েছে। একুশের সেই ত্যাগ-তিতিক্ষার কথামালা বাঙালিকে আজো দীপ্ত থেকে দীপ্ততর করে। আমাদের সংগ্রামের পথ চেনায়-সংগ্রামে নামতে শেখায়, জিততেও শেখায়। একুশ সে সংগ্রামের গনগনে অশ্রুবিন্দু। জেগে ওঠার জেগে থাকার অশ্রুবিন্দু। ■

শিশু সাহিত্যিক

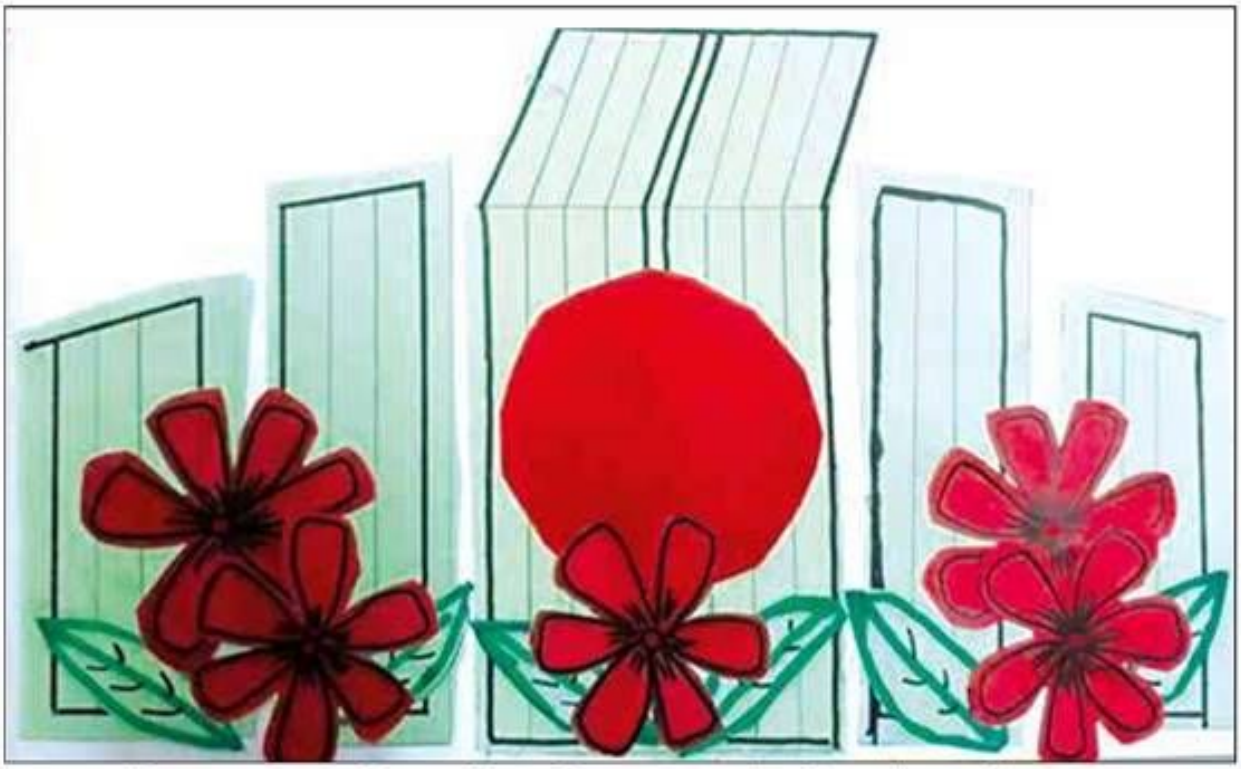

নাকীবাহ রুকায়াত নাসিম, তৃতীয় শ্রেণি, কুকাবুরা আউস্ট্রালিয়ান স্ট্যান্ডার্ড স্কুল, ঢাকা

গল্প

কাজলের প্রভাতফেরি

রফিকুর রশীদ

কাজল এ বাসার গৃহকর্মী।

বয়সে মিতুলেরই সমান প্রায়। এমন কি এক আধ বছরের বড়ো হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে উচ্চতায় দুজনেই সমান। কাজলের চোখমুখ চেহারা ভারি সপ্রতিভ। গায়ের রং মোটেই কালো নয়, বলা যায় উজ্জ্বল শ্যামলা। কিন্তু কেন যে তার নাম হয়েছে কাজল, সে কথা তার জানা নেই। বলতে গেলে নিজের সম্পর্কে সে বিশেষ কিছুই জানে না। এক অর্থে সে পথের ছেলে, পথে পথেই তার বেড়ে ওঠা। রনবীর চোখে যারা টোকাই, কাজল সেই দলের একজন। শাহবাগ কিংবা হাইকোর্ট-প্রেসক্লাবের মোড়ে ট্রাফিক সিগনালে থেমে যাওয়া গাড়ির ফাঁকফোকরে ফুলের মালা বিক্রি করা অথবা গাড়ির কাচ মুছে দেয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে মিতুলের বাবা একদিন এই কাজলকে ধরে নিয়ে আসে বাসায়। সেই থেকে এ বাসার সবার ফাই ফরমাশ খাটে অম্লান বদনে হাসিমুখে।

নিজের সম্পর্কে সত্যিই কিছু জানে না কাজল, নাকি জেনেশুনেও কিছুই বলতে চায় না– এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। বাবা কিংবা ভাইবোন সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না সে। কারো নামও

বলতে পারে না সে। কেবল তার মনে পড়ে মাকে। খুব সুন্দর তার মা। মিতুলের মায়ের মতোই। তাই মিতুলের মাকে সে প্রথমে আম্মা বলেই ডাকতে শুরু করে, কিন্তু নদী আপু আপত্তি জানায়। সে আপত্তি মেনেও নেয় তার মা, পরামর্শ দেয়,খালাম্মা বলে ডাকিস।

তারপর জানতে চায়,

তোর মা থাকে কোথায়?

না, সে খবর তার জানা নেই। অনেক দিন হয়ে গেল সে তার মাকে দেখেনি। তাই তো এ বাসার খালাম্মাকে দেখে প্রথমে সে চমকে উঠেছিল। সেটা ছিল তার প্রথম দেখার ঘোর। সেই ঘোর কেটে যাবার পর এক সময় সে স্বীকার করেছে না, একেবারে একই রকম নয়। তার মায়ের নাকের গড়ন এবং গায়ের ধরন আরো একটু চাপা। তো সে যা-ই হোক, কাজলকে নিয়ে এ বাসায় অন্য এক সংকট দেখা দেয়। না, ঠিক কাজলকে নিয়ে তো নয়, কাজলের জামাকাপড় নিয়ে সংকট। যেহেতু উচ্চতা এবং দৈহিক গড়নে সে প্রায় মিতুলেরই সমান, তাই মিতুলের পুরানো জামাকাপড় তার গায়ে বেশ ফিটফাট হয়। এমন কি কখনো - সখনো দূরে থেকে বা পিছনে থেকে তাকে মিতুল বলেও ভুল হয়। পারিবারিক সমস্যা এইখানে। তখন মিতুলই প্রস্তাব দেয়, বেশ, তাহলে ওকে নতুন জামাকাপড় কিনে দাও।

তা-ই দেওয়া হয় কাজলকে।

কিন্তু নতুন জামাকাপড় পাবার পর খুশি হবার বদলে কাজল গোপনে গোপনে একটুখানি দুঃখ পায়, তবে সে দুঃখের কথা সে কাউকে বলে না। গায়ে নতুন জামা দেখে মিতুলের মা প্রশংসা করে, বাহ্, কী সুন্দর স্ট্রাইপ শার্ট! তোকে যে একেবারে ফুলবাবুর মতো দ্যাখাচ্ছে!

কাজল একবার গায়ে চড়ানো নতুন জামার দিকে তাকায় এবং তারপর একবার খালাম্মার হাসিখুশি মুখের দিকে তাকায় ; তবু সেই খুশিতে সে শামিল হতে পারে না। জোর করে একটুখানি হাসতে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে তার চোখের পাতা ভিজে আসে। তখন সে কৌশলে খালাম্মার সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। আড়াল করে চোখের পানি।

বেশ কয়েকদিন পর ইউনিভার্সিটির হল থেকে নুরু কাকা এসে বলে, এই ছোঁড়া, তোকে যেন চেনা চেনা লাগছে!

কাজল চোখ তুলে তাকায়। মিতুল জানায়, বাবা ওকে রাস্তা থেকে ধরে এনেছে। নুরু কাকা বলে, দাঁড়া দাঁড়া, কোথায় যেন দেখেছি!

অবশেষে নুরু কাকার বেশ মনে পড়ে -

কাজলকে সে শাহবাগ মোড়ে কিংবা চারুকলার বকুলতলায় দেখেছে।

চারুকলা! কেন সেখানে কী?

নিজের সম্পর্কে কিছুই জানাতে চায় না কাজল। কিন্তু এই একটি জায়গায় এসে মুখ খোলে সে। স্পষ্ট জানায়, ছবি আঁকা দেখতে তার খুব ভালো লাগে।

মিতুল ফোঁড়ন কাটে,

আর্টিস্ট হবি নাকি তুই?

সরাসরি উত্তর দেয় না কাজল। তবে দৃঢ়ভাবে জানায়-- একদিন সে নাকি তার মায়ের ছবি আঁকতে চায়।

আঁকাআঁকিতে কাজলের আগ্রহের ব্যাপারটা এ বাসায় ধরা পড়ে আরো কয়েক মাস পরে। মাঝেমধ্যেই মিতুলের ছোটো বোন মুগ্ধ কান্নাকাটি করে– তার ড্রয়িংবক্স হঠাৎ এলোমেলো হয়, রং পেন্সিল হারায়, এসব যায় কোথায়? ইঁদুরে টেনে নিয়ে যায়, নাকি কোনো মানুষেই টানাটানি করে?

হ্যাঁ, মিতুল একদিন হাতেনাতে ধরে ফেলে।

সেদিন কাজলকে বাসার মধ্যে রেখে বাইরে থেকে তালা দিয়ে সবাই মিলে এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যায় মিতুলরা।

ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি। দরজা খুলে বাসায় ঢুকতেই মিতুল এক দৌড়ে চলে যায় দক্ষিণের বারান্দায়। গিয়ে দেখে উবু হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কাজল। তার হাতের তলে চাপা পড়ে আছে মিতুলের

পুরনো খাতার ছেঁড়া পাতা। মুগ্ধর রং পেন্সিল এনে সে বুঝি তার মায়ের ছবি আঁকতে চেয়েছিল। আঁকা হয়নি পুরো ছবি। তার আগেই ঢুলে পড়েছে ছবির উপরে। মিতুলের মনের ভেতরে কী যে ভাবান্তর হয় এই দৃশ্য দেখে, পরদিন সে কাজলের জন্যে রং পেন্সিল ড্রয়িংখাতা কিনে আনে নিজের জমানো পয়সা দিয়ে। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে জমানো টাকা এভাবে খরচ করতে পেরে তার বেশ ভালো লাগে। কাজলের হাতে ড্রয়িংসামগ্রী তুলে দিয়ে মিতুল বলে, যখনই কাজকর্মের ফাঁক পাবি, তখনই ছবি আঁকবি। তোর যা ইচ্ছে তাই আঁকবি। কেউ তোকে কিছু বলবে না।

মিতুল ভাইয়ার এই অনুমতিটুকু খুব ভালো লাগে কাজলের। মুখে প্রকাশ না করেও মিতুল আর কাজল এভাবেই একে অপরের অন্তর্জগতে একান্ত নিভৃতে আপন আপন ছায়াবীথি গড়ে নেয়। তবু সবটুকু দূরত্ব কি আর নিঃশেষে ঘোঁচে! তা ঘোঁচে না বটে, তাই বলে সহসা সেটা চোখেও পড়ে না সবার।

এই তো কিছুদিন আগে একুশের সকালে এ বাসার সবাই গেল প্রভাতফেরিতে। কাজলের কথা কেউ ভাবলই না। অন্যান্যবার শুধু ছেলেমেয়েরাই যায় ইশকুলের পক্ষ থেকে। এবার আগেরদিন রাতেই ইউনিভার্সিটি থেকে নুরু কাকা এসে বলল– সবাইকে যেতে হবে প্রভাতফেরিতে। আমাদের একুশ এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আমরাই যদি সবাই অংশ না নিই–

বাসার সবাই গেল প্রভাতফেরিতে। এমন কি সবার ছোটো মুগ্ধ পর্যন্ত। কাজল তখন একা একা বাসায় বসে কী করে! সকালবেলার কাজকর্ম তার হাতে কম নেই মোটেই। কাজ করলে অনেক কাজ। কিন্তু মন বসে না কোনো কাজেই। নিজেকে ই প্রশ্ন করে কাজল– কেন তোর মন খারাপ? প্রভাতফেরিতে যাবি? ভেতর থেকে ঠিক মতো জবাব পায় না। প্রভাতফেরির জন্যে মন খারাপ করবে কেন? প্রভাতফেরি তো কম দেখেনি সে। শহিদমিনারে ফুল দেয়াকে কেন্দ্র করে মারামারিও দেখেছে। আরও কত কিছুই সে দেখেছে। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো– গানটা তার খুব ভালো লাগে। কেমন যেন রক্তের মধ্যে দোলা দেয়। ওই যে সেই সুর ভেসে আসছে। বেশ শোনা যাচ্ছে। দূরে নয়, কাছাকাছি কোথাও ছেলেমেয়েরা গাইছে অবিস্মরণীয় শোকগাথা। ওদের সঙ্গে গলা মেলালেই হয়। আজকের দিনে এ গান তো সবার। না, তবু সে প্রাণ পায় না, প্রেরণা পায় না। কী চাই কাজল তোমার? বলো কী চাই? না,উত্তর নেই। অভিমানে গলা ভারি হয়ে আসে– কেউ একবার ডাকল না তাকে! মিতুল ভাইয়ারও মনে পড়ল না!

কাজল তখন ড্রয়িংসামগ্রী নিয়ে নিজের মতো করে বসে যায়। বড়ো একটা কাগজে শহিদমিনার এঁকে ফেলে ফ্রি-হ্যান্ডে। এটা এমন কঠিন কিছু নয়। শহিদমিনারের পাদদেশ ভরিয়ে দেয় ফুলে ফুলে। এত ফুল আঁকতে আঁকতে কাজলের বুকটা ভরে যায়। আর কোনো অভিমান থাকে না কারো উপরে।■

শিশু সাহিত্যিক

গল্প

বর্ণমালা

নাহার আহমেদ

কাব্যদের বাড়িতে এই প্রথম ছোটো চাচার ঘরে মেয়ে হলো। কাব্যরা দুভাই। মেঝো চাচারও তিন ছেলে, ছোটো চাচার ঘরে মেয়ে হওয়াতে বাড়ির সবাই মহা খুশি।ওরা সবাই যৌথ পরিবারে থাকে। দাদু-দাদাকে নিয়ে ওরা সবাই মিলেমিশে থাকে। কাব্যর দাদু একজন মুক্তিযোদ্ধা ।

৫২-এর ভাষা আন্দোলনেও দাদু একজন ভাষাসৈনিক হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন তাই বাংলা ভাষার প্রতি দাদুর ভীষণ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। কাব্যের দাদু সত্যিকার অর্থে একজন দেশপ্রেমিক। দাদুই নাম রাখলেন। ছোটো ছেলের ঘরের এই নাতনির নাম–বর্ণমালা । দাদি, জেঠিমা, কাকিমা বাড়ির সবারই ভীষণ পছন্দ হলো নামটা, তবে মজার ব্যাপার হলো আদর করে, একেক জন বর্ণমালাকে এক এক বর্ণ ধরে একেক সময় ডাকত। কেউ ডাকত প, কেউ ডাকত ক । তবে সবাই আদর করেই ডাকত। তবে সবসময় না। দাদুও মাঝেমাঝে বলত-কাব্য । আমার অ টা কইরে? ছোট্ট বর্ণমালা কিছু না বুঝেই শুধু খিলখিল করে হাসত। পাঁচ বছর যেতে না যেতেই বর্ণমালাকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হলো। সবার আদরের বর্ণমালা বাড়ির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। প্রথম যেদিন বর্ণমালা স্কুলে যাবে, সবাই কি ব্যস্ত ! পানির ফ্লাস্ক, টিফিন বক্স, স্কুল ব্যাগ সবাই মিলে সব কিছু গুছিয়ে দিল। বর্ণমালাও খুব আনন্দের সাথে হেলেদুলে স্কুলে গেল।

পড়াশুনা, ছবি আঁকা, ছোটো ছোটো ছড়া বলা, সব কিছুই বর্ণমালা খুব আনন্দের সাথে করত। দেখতে দেখতে বছর পার হলো। বর্ণমালা প্লে ক্লাস থেকে নার্সারিতে উঠল। ছুটির দিনে বাড়ির সবাই বিকেল বেলা জমিয়ে আড্ডা দিত। সবাই মিলে মাঝে মাঝে

বর্ণমালার আধো আধো কথার ছোটো ছোটো ছড়া, ইংরেজি রাইমস খুব মজা করে উপভোগ করত । বর্ণমালা কখনো দাদুর কোলে, কখনো মার কোলে, কখনো বা বাবার কোলে বসে তার পারফরমেন্স দেখাত। বর্ণমালা খুব উৎসাহ পেত আবৃত্তি করতে। দাদু সবসময় বলে

-তুই হোলি গিয়ে ৪৯টা বর্ণের মালায় গাঁথা সুন্দর একটা মেয়ে। যে যে নামেই ডাকুক না কেন তুই বর্ণমালা, বর্ণমালাই থাকবি ? মানুষের নামে কি আসে যায়? মানুষ তার কাজের জন্যই প্রশংসা পায় ।

ছোট্ট বর্ণমালা কী বুঝল, তা বোঝা গেল না। শুধু একটু হাসল এবার যখন ফেব্রুয়ারি মাস এল, দাদু বর্ণমালাকে ডেকে বলল–দাদুভাই, এসো তোমাকে একটা ভাষার গান শিখাব। ফেব্রুয়ারি হলো ভাষার মাস। এই মাসেই আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন করেছিলাম। বুকের রক্ত দিয়ে আমাদের সেই অধিকার আদায় করেছিলাম।–তাই? তাই? কোন গান শিখাবে দাদু ?-'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' দাদু আর নাতনি মিলে চার লাইন গান খুব মন দিয়ে গাইতে থাকে। ছোট্ট বর্ণমালা খুব আনন্দ পায় দাদুর কাছে গানটা শিখে ।

–শোন দাদু, আর একটু বড়ো হলে তোমাকে একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে সব ইতিহাস শোনাব। তুমি জানবে একুশে ফেব্রুয়ারি কী ? 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' কী? আমরা বাঙালি জাতি কত সাহসী? 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' এই বিখ্যাত গানটাও তোমাকে শিখতে হবে। বর্ণমালাও ঘাড় নেড়ে দাদুর সাথে সায় দেয়। দাদু জানে এত ছোটো বর্ণমালাকে এসব ইতিহাস বললেও কিছুই বুঝবে না। বর্ণমালা এটুকু বোঝে যে, দাদু বাংলা ভাষাকে খুব ভালোবাসে। আর এই স্বরবর্ণ ব্যাঞ্জনবর্ণ মিলেই বাংলা ভাষা। এই ৪৯ টা বর্ণকেই বলে বর্ণমালা। এখন বর্ণমালাও খুব খুশি তার নাম নিয়ে। তার খুব ভালো লাগে নিজের এই নামটা। ■

শিশু সাহিত্যিক

বিশ্বের মিষ্টি ভাষা বাংলা

বন্ধুরা তোমরা কী জানো, পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি বাংলা ভাষা, হ্যাঁ বন্ধুরা বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের সংস্কৃতি বিষয়ক অধিসংস্থা ইউনেস্কো পরিচালিত ২০১০ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী 'বাংলা বিশ্বের সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা'। সেই তালিকায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে ছিল যথাক্রমে স্প্যানিশ এবং ডাচ ভাষা। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে সমীক্ষার ফলাফলের ব্যত্যয় ঘটেনি। বাংলা ভাষা ধরে রেখেছে আগের অবস্থান। ভাষা নিয়ে তথ্য সংগ্রহকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা 'এথনোলগ'র সর্বশেষ ২০২০ সালে প্রকাশিত

প্রতিবেদনে (২৩তম সংস্করণ) তুলে ধরা হয়েছে বিশ্বের ১০০টি বহুল ব্যবহৃত ভাষার তালিকা। সেই সঙ্গে সংস্থাটি তুলে ধরেছে মাতৃভাষা হিসেবে ভাষাগুলোর ক্রমিক অবস্থান। সংস্থাটির মতে, পৃথিবীতে ৭ হাজার ১১৭টি জীবন্ত ভাষা রয়েছে। বিশ্ব-ভাষা তালিকায় মাতৃভাষা হিসেবে বাংলার অবস্থান পঞ্চম এবং বহুল ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে সপ্তম। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বাংলায় কথা বলেন ২৬ কোটি ৫০ লাখ মানুষ। ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলা ভাষীর সংখ্যা ৩১ কোটি ৬০ লাখে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিবেশী দেশ ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দির অবস্থার বাংলার পরে, ষষ্ঠ স্থানে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর অবস্থান ১৮তম। এছাড়া পাকিস্তানের লাহান্দা ভাষা রয়েছে বিশ্বভাষা তালিকার দশম স্থানে এবং ভারতের তেলেগু, মারাঠি ও তামিল ভাষার অবস্থান যথাক্রমে ১৫তম, ১৬তম ও ২০তম। বহুল ব্যবহৃত ভাষার তালিকায় শীর্ষ দশ ভাষার অন্যগুলো হচ্ছে মান্দারিন (চীনা), ইংরেজি, স্প্যানিশ, ফরাসি, আরবি, রুশ, পর্তুগীজ এবং ইন্দোনেশীয়।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

বিশ্বে বাংলা ভাষার চর্চা

ফারিন আহমেদ খান

মাতৃভাষার জন্য জীবন দানের উদাহরণ একমাত্র আমাদেরই রয়েছে। তাই তো ইউনেস্কো ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ঘোষণা বাংলা ভাষার মর্যাদাকে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতার শিখরে। যা আমাদের গর্ব ও অহংকার। এ সম্মান দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে পৌছে গেছে সারাবিশ্বে। শুধু বাঙালিই নয়, বাংলা ভাষার চর্চা এখন সারা বিশ্বে। চার মহাদেশের ৩০টি দেশের শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা ও চর্চা হচ্ছে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়। এর বাইরে সাম্প্রতিক সময়ে চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, পোল্যান্ড, রাশিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, চেক রিপাবলিক, কানাডা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা হয়ে থাকে। এসব গবেষণায় বিদেশি ছাড়াও বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গবেষকরা যুক্ত আছেন।

সংখ্যা অনুসারে বিশ্বে বাংলা ভাষার অবস্থান পঞ্চম। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী এ ভাষায় কথা বলেন প্রায় ২৬ কোটি ৫০ লাখ মানুষ। কিন্তু কিছু গবেষকের মতে, বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। বাঙালিরা ছড়িয়ে আছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে। তারা যেখানেই গেছেন সেখানেই বাংলা ভাষাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনে বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আর ২০০২ সালে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন বাংলাকে সম্মান জানাতে তাদের সরকারি ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় সে দেশে যেসব এশীয় ভাষার জন্য গুরুত্ব দিয়েছে বাংলার অবস্থান তাতে তৃতীয়।

বিশ্বের অন্তত ছয়টি দেশের রাষ্ট্রীয় বেতারে বাংলা ভাষার ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেল রয়েছে। আরও ১০টি দেশের রেডিওতে বাংলা ভাষায় আলাদা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে। যুক্তরাজ্যে ছয়টি ও যুক্তরাষ্ট্রে ১০টি বাংলাদেশি মালিকানাধীন বাংলা ভাষার টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে। বাংলা ভাষায় যুক্তরাজ্য থেকে মোট ১২টি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইতালিতে বর্তমানে পাঁচটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা এবং রোম ও ভেনিস শহর থেকে তিনটি বাংলা রেডিও স্টেশন পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া ডেনমার্ক, জার্মানি, সুইডেনসহ ইউরোপের আটটি দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশ থেকে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত ও অনলাইন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সব মিলিয়ে বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষার চর্চা দিন দিন বাড়ছে। বাংলা ভাষার এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।■

শিক্ষার্থী, ইউল্যাব বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষ্ণচূড়ার একুশ

কামাল হোসাইন

ফুলের নাম কৃষ্ণচূড়া। যাকে আমরা সকলেই চিনি। সবুজ ডালে লাল রঙে ফুটে থাকে গাছ আলো করে। সেই কৃষ্ণচূড়া আজ কিছুতেই ঘুমাবে না। ঘুমাতে পারবে না সে। কেন ঘুমাবে? রোজই তো সে ঘুম যায় মগডালের আগায় শুয়ে শুয়েই। আজকের এই বেলা একটু নাইবা ঘুমাল! অবশ্য প্রতিদিন সন্ধ্যার পরপরই তার ঘুমের জন্য চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে ওঠে। মা বা বোনেরা কিছু কথাবার্তা বলতে চাইলেও সে তা শুনতে নারাজ। তার আগে অবশ্য গাছের পাতাবন্ধুদের সঙ্গে অল্পকিছু গল্প করে, তারপর ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায় কৃষ্ণচূড়া। এই হলো রোজকার সন্ধ্যার রুটিন তার।

তবে হ্যাঁ, আজ সে কিছুতেই ঘুমাবে না। আর এজন্য সে আজ দিনের বেলায় বেশ কিছুটা সময় ঘুমিয়েও নিয়েছে, যেন আজ রাতভর সে জেগে থাকতে পারে। ঘুম এলেও ঘুমের কাছে সে আজ কিছুতেই হার মানবে না।

সকালের আগেই যে তাকে একটা বিশেষ প্রয়োজনে বেরিয়ে পড়তে হবে। আর তা করতে না পারলে তার আক্ষেপের শেষ থাকবে না যে আজ! কারণ, এমন দিন বছরে মাত্র একবারই আসে। বার বার আসে না। আর সেই প্রয়োজনটা সে অনেকের মতো সবার আগে-আগেই করতে চায়। আগে-আগে না করলে যে তার মনটাই খারাপ হয়ে যাবে। সে একা হলেও অনেকের পরম আদরে গড়া ফুলের ডালি হয়ে হাতে হাতে পৌঁছে যাবে তার গন্তব্যে।

আজ বিশ ফেব্রুয়ারি। রাত পোহালেই একুশে ফেব্রুয়ারি। মহান ভাষা দিবস। কত কত মানুষ একসঙ্গে আসছে কাকভোরে খালি পায়ে একটা শোকের আবহে সাদা-কালো পোশাক পরে শহিদ মিনারে যাবে ফুল দিতে। কালো পোশাক কেন? কারণ, কালো হচ্ছে শোকের প্রতীক। কাল তো শোকেরই দিন।

এই যে একসঙ্গে দলবেধে খালি পায়ে ফুল হাতে শহিদমিনারে যাওয়াকে প্রভাতফেরি বলে, সেটা সে জানে। সকলেই ফুল নিয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ভাষার দাবিতে মিছিলে গুলিবিদ্ধ হওয়া সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে। আর সেই সব হাজারো মানুষের হাতে হাতে কাল তাকে না থাকলে চলে?

কৃষ্ণচূড়া বাঙালির ভাষা দিবসের গল্পটা জানে। সে তার মায়ের কাছে শুনেছে। তার মা-ও তার দাদির কাছ থেকে শুনেছে। এভাবে পরম্পরায় সবাই এই গল্পটা জেনে আসছে। সে তো আর আজকালকার কথা নয়, সেই ১৯৫২ সালের কথা।

এই জনপদের মানুষ বাঙালি। বাঙালির ভাষাও তাই বাংলা। পৃথিবীতে অনেক জাতি-গোষ্ঠী রয়েছে। ওইসব জাতি-গোষ্ঠীর নিজ নিজ আলাদা ভাষাও আছে। সে ভাষায় কথা বলে তারা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে। এখানকার মানুষ বাঙালি বলে বাংলা তাদের মাতৃভাষা। মানে মায়ের ভাষা। মায়ের ভাষায় কথা বলে তারা তাদের হৃদয় জুড়ায়। কিন্তু এই ভাষা নিয়ে দারুণ এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র হয়েছিল।

ষড়যন্ত্র মানে বাংলা ভাষায় কথা বলতে না দেওয়ার পাঁয়তারা। কারা করল এ ষড়যন্ত্র এ কথা জানতে হলে সকলের আরো কিছু কথা জানতে হবে। আর তা হলো– এদেশ একদিন 'বাংলাদেশ' ছিল না। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর দেশটি আলাদা একটি লাল-সবুজ পতাকা পেয়েছিল।

এ ভূ-খণ্ডের নাম ছিল তখন পূর্ব-পাকিস্তান। পাকিস্তানিরা শাসক ছিল এ দেশের। তাদের অপর অংশের নাম ছিল– পশ্চিম পাকিস্তান।

পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে প্রায় হাজার মাইল ভারতের এলাকা। তার উপর পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষেরা ছিল হিংস্র ও স্বার্থপর টাইপের। তারাই পাকিস্তানের কর্তা। তারা পূর্ব-পাকিস্তান মানে, বাংলার মানুষদের মোটেও সহ্য করতে পারত না। এখানে পাট হতো, সেই পাট বিক্রি করে বিদেশ থেকে পাওয়া টাকাগুলো ওরা নিজেদের স্বার্থে ব্যয় করত। বাংলার মানুষ বড়ো চাকরি এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। এমনকি বাঙালির মুখের ভাষা পর্যন্ত কেড়ে নিতে চাইল। বাঙালির ভাষা, বাঙালির আশা, বাঙালির চলা, বাঙালির বলা, স্বপ্ন-সাধ সবকিছুতে ছিল তাদের থেকে চরম অমিল।

কারণ, তারা ছিল উর্দু নামের আলাদা একটা ভাষার মানুষ। যেহেতু তারা শাসক ছিল, তাই তারা চেয়েছিল গোটা পাকিস্তানের ভাষা হোক উর্দু। বাংলা নয়, রাষ্ট্রীয় ভাষা হবে উর্দু। আর এ ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল পাকিস্তানের সে সময়ের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানেরা।

আর ভাষাই যদি পালটে যায়, তাহলে বাংলাভাষীদের কী হবে? তা কি মেনে নেওয়া যায়? অসম্ভব। ওদের ওই অনৈতিক ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শত হাজার কোটি বাঙালি কণ্ঠ 'না না না' বলে তারা যে এটা চায় না তা বুঝিয়ে দিল। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিল-স্লোগান উঠল– 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'আমাদের দাবি মানতে হবে'।

মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে এ রকম দাবির আওয়াজে ভিনদেশি শাসকেরা ভয় পেয়ে গেল। রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার ব্যাপারে তারা আরো কঠোর হলো। একদিকে শাসকগোষ্ঠীর কঠোর মনোভাব, অন্যদিকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে কোটি কোটি বাঙালির অগ্নিপণ।

১৯৪৭ সাল থেকে বাঙালির এ আন্দোলন শুরু হয়ে ১৯৫২ সালে তা আরো জোরদার হয়ে ওঠে। অবস্থা বেগতিক দেখে পাকিস্তানি শাসকেরা ১৪৪ ধারা জারী করল। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা ওদের জারী করা ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি নিলেন। ১০ জন ১০ জন করে একেকটা মিছিল ১৪৪ ধারা ভাঙবেন– এ পরিকল্পনা হলো। তারপর চলে চূড়ান্ত মিছিল। দাবির একাট্টা সংগীত।

সেই দাবির মিছিলে পুলিশ চালাল গুলি। সে গুলিতে ঢাকার রাজপথ রক্তে ভেসে গেল। লাল হয়ে উঠল পিচঢালা পাকা সড়ক। শহিদ হলেন বাংলা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান, বাঙালি বীর আবুল বরকত, রফিকুদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার।

এটা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা।

পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি শহিদ হন শফিউর রহমান, আবদুল আওয়াল, তাঁতিবাজারের সিরাজুদ্দিন, কিশোর শহিদ অহিউল্লাহসহ অজ্ঞাত অসংখ্য মানুষ। ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলিতে আহত আবদুস সালাম ৭ই এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

দুনিয়া জুড়ে এমন ইতিহাস আর কোথাও নেই। ভাষার দাবিতে জীবন দেওয়ার এমন ঘটনা বিরল। আর বিরল ঘটনা যাতে গোটা বিশ্বের মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, বাঙালির ২১শে ফেব্রুয়ারি যাতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রূপ পায় সেজন্য জাতিসংঘ ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০ তম সাধারণ অধিবেশনে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করে এবং ১৮৮ ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে তা পাসও হয়।

সেদিন যে ঢাকার কালো পিচঢালা রাজপথ শহিদের লাল রক্তে ভেসে গিয়েছিল, সেই থোকা থোকা রক্ত যেন আজ কৃষ্ণচূড়া হয়ে সে-ই তার বুকে ধারণ করেছে। তাই বুঝি এই ফাল্গুন মাসের পুরোটা সময় জুড়ে সবুজ গাছের ডালে ডালে লালফুল হয়ে শহিদের স্মৃতি হয়ে ফুটে থাকে কৃষ্ণচূড়া।...

মায়ের কাছে যখন এসব শুনেছে কৃষ্ণচূড়া, তখন কষ্টে ওর ছোট্ট বুকটা হু হু করে উঠেছে। ভেতরে ভেতরে গুমরে গুমরে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে সে। মানুষ কী করে এমন নিষ্ঠুর হতে পারে! ভাবতে পারে না কৃষ্ণচূড়া।

তবে সে যে লালফুল হয়ে কৃষ্ণচূড়া হয়েছে, এই কথা ভাবতে তার খুব ভালো লাগে। যদিও ঘটনাটা মোটেও উপভোগ করার নয়, বরং খুবই বেদনার। তবুও মায়ের ভাষা বাংলার দাবিতে শহিদ হওয়া কতগুলো মানুষের রক্ত স্মৃতি হয়ে প্রতি বছর সবুজ ডালে ফুটে থাকা, তাদের কথা মনে করা... এও তো কম গৌরবের ব্যাপার নয়। এজন্য তার বেজায় গর্ব হয়।

বুকের ভেতরটায় কেমন যেন একটা জ্বালা আর অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব হয় তার। অচেনা-অজানা বেদনা বলতে পারো তাকে। তবে কি তার অনুভূতি মহান একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ ছেলেদের মায়েদের মতোই? মা যেমন তার বুকের ধনকে কখনো ভুলে

সেই থেকে সারা বিশ্বে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এখন বাঙালির মহান এ শহিদ দিবস সমগ্র পৃথিবীতে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। এটা বাংলা ভাষার ও বাঙালিদের জন্য বিরাট সম্মানের ব্যাপার।

মায়ের ভাষার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের কি কখনো ভোলা যাবে? যাবে না। যতদিন সূর্য পুবদিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যাবে, মানুষ ততদিন এ সকল ভাষা শহিদকে বুকের আবেগ দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে স্মরণ করবে।

থাকতে পারে না, সেও তো তার বুকের গহীনে তেমন অনুভূতিই পোষণ করে! ছেলে হারানো একজন মায়ের মতোই তারও চোখে অশ্রুর বন্যা।

প্রায় দু'বছর যাবত মহামারি করোনা পৃথিবীর ওলট-পালট করে দিয়েছে। অনেকটা সময় ধরে মানুষ ঘর থেকে বেরুতে পারেনি। পারেনি সেভাবে একুশের ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। এখনো সেই পরিস্থিতি চলছে বিশ্ব জুড়ে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। তাই কৃষ্ণচূড়া নিজে নিজেই ভেবে রেখেছে– এই করোনা মহামারিতে যদি মানুষ ঘর থেকে বের হতে না পারে, শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে না পারে, তাহলে সে-ই দেশের সকল কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুল মিলে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের ডালি হয়ে শ্রদ্ধা জানাতে ভিড়ে যাবে শহিদস্মৃতির পাদদেশে। ■

প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

ইরফান হোসাইন, ২য় শ্রেণি, ইন্দ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খুলনা

কলমবন্ধু

ওবায়দুল মুন্সী

প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা, কেমন আছ? আশা করি, ভালো আছ সবাই। ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই আমার চাওয়া। কারণ- 'আমি তোমাদের কলমবন্ধু'! এবার হই-হুল্লোর বাদ দিয়ে মনোযোগ সহকারে আমার গল্প শুনো-

আমার নাম কলম। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশর দেশে আমার জন্ম। আমি বড়ো হয়েছি প্রাচীন মিশরেই।

আমার নামের মূল অর্থ হচ্ছে-'লেখনী'। আমার মূল আবাসন 'কাগজ' সেকালে কোনো কাগজ ছিল না। তাই আমি বসবাস করতাম বৃক্ষপত্র ও তার ছালে। তখন আমি অনেক রূপ ধারণ করতে পারতাম। কখনো নলখাগড়া, শর বা বেণু বাঁশের কঞ্চি অথবা ফাঁপা খণ্ডের রূপ ধারণ করি। মিশরের মানবেরা আমার সেই রূপগুলোকে আরো অপরূপ করে সাজিয়ে একটি জিনিসে চুবিয়ে আমাকে দিয়ে লেখতো। আর সেই জিনিসটার নাম ছিল 'কালি'। সেটা ছিল গাছের কষ ও নানা রকম প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি। এভাবে বহু শতাব্দী চলে যায়। এক সময়ে আমি নলখাগড়ার রূপ বদল করে পাখির পালকের রূপ ধারণ করি। আমার রূপ ধারণের প্রধান উপকরণ ছিল রাজহাঁসের পালক! সেই পালকরূপে শক্ত হয়ে আমার গোড়া বা মাথা সূক্ষ্মভাবে সুচালো করি, যেন আমাকে দিয়ে লিখতে বেশ আরাম লাগে। মধ্যযুগে আমার পাখির পালকরূপের মোটা গোড়ায় কালি লাগিয়ে সেটাই আমার মতো করে লেখা হতো। প্রাচীন পুঁথিও লেখা হতো এভাবে।

এরপর আসে আমার আধুনিক যুগ। ১৮ শতকে এসে স্টিলের নিবযুক্ত আদি রূপের ঝরনারূপ ধারণ করি। এখানে আমাকে আর কালিতে চুবিয়ে লিখতে হতো না, আমার ভেতরেই থাকত স্বল্প পরিমাণ কালির ভাণ্ডার। ১৭৮৭ সালে এরূপেই আমাকে দিয়ে আমেরিকার সংবিধান স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তবে ৫০ থেকে ৬০ বছর পূর্বেও আমি বঙ্গদেশের কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিলাম কঞ্চি বা নলখাগড়া রূপে আর লেখার জন্য ছিল কাঠকয়লার কালি ও তালপাতা।

তোমরা হয়ত জানো না যে- মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরান শরীফেও আমার ও কালির কথাই উল্লেখ আছে। সুরা লোকমানের ২৭ নম্বর আয়াতে বর্ণিত আছে, 'পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি আমি হই এবং এই যে সমুদ্র ইহার সহিত যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হইয়া কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী লিখা নিঃশেষ হইবেনা, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' অন্যদিকে হাদিসের কথায়–

'জ্ঞান সাধকের হাতে আমি ও কালি, শহিদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।'

বন্ধুরা, এবার বুঝেছ আমার কত মহিমা!

তাই সবসময় আমাকে সাথেই রাখবে। আমায় দিয়ে তোমাদের খাতায় লিখবে–

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ,এ ঐ ও ঔ কিংবা

ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ...। ■

কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

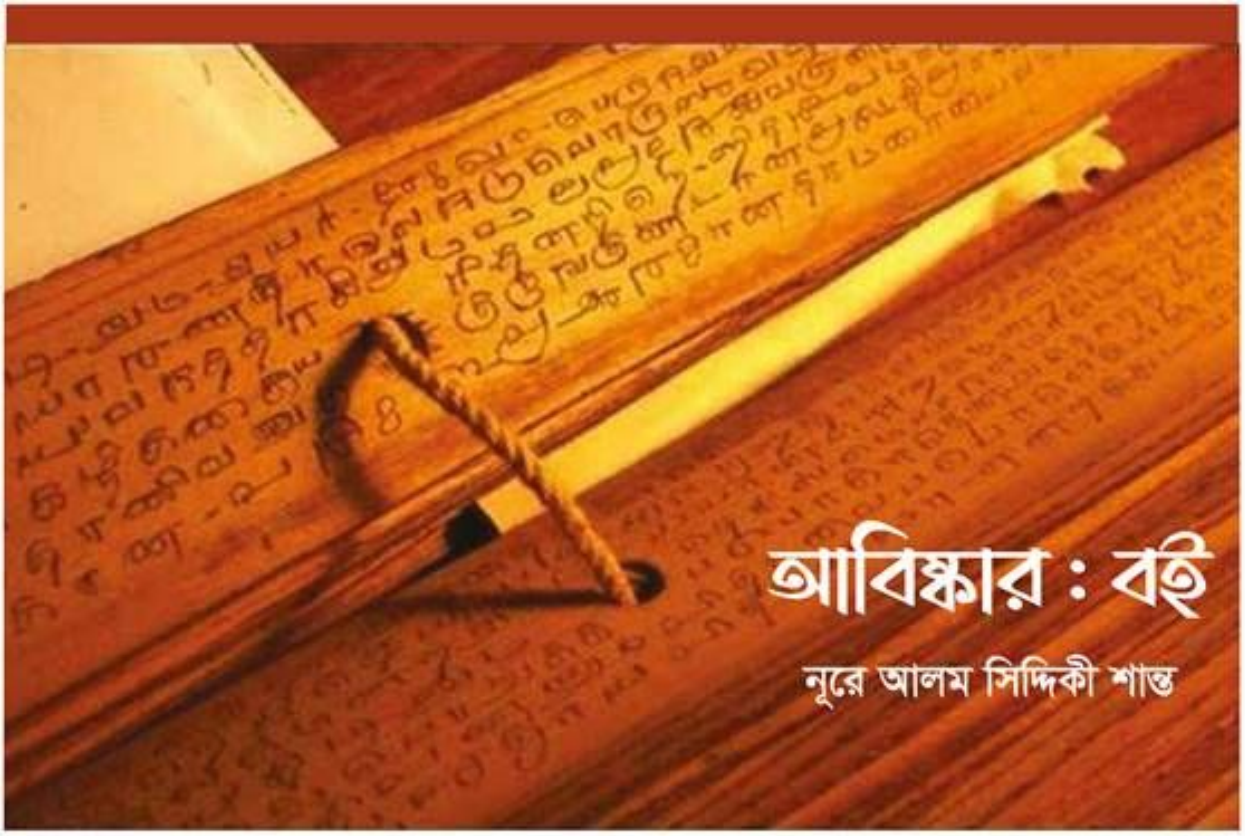

আবিষ্কার : বই

নূরে আলম সিদ্দিকী শান্ত

আজকে আমরা রঙিন মলাটে বাঁধানো যে বই পড়ছি, তা একদিনে আবিষ্কার হয়নি। হাজার হাজার বছরের সাধনার কল্যাণে এসেছে এই বই। সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ যখন প্রথম লিখতে শুরু করে তখন তারা প্রস্তরখণ্ড, শিলালিপি, কাদামাটির পোড়ানো ফলক, গুহার দেয়াল, পশুর চামড়া ইত্যাদি ব্যবহার করে লিখত। যতদূর জানা যায়, পাথরে লেখার প্রথম প্রচলন শুরু হয় সম্রাট অশোকেরও জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে আসিরিয়া ও ব্যাবিলনে। মাটি খুঁড়ে ব্যাবিলনের একটি লাইব্রেরিতে বাইশ হাজারের বেশি পাথরে লেখা বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাথরে লেখা বেশ ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য ছিল বলে সবাই লেখার জন্য বিকল্প পদ্ধতির অনুসন্ধান করতে শুরু করে। ঠিক তখন মিশরের লোকেরা নতুন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করে।

মিশরে নলখাগড়ার মতো দেখতে প্যাপিরাস নামক এক ধরনের গাছ জন্মাত। মিশরীয়রা এই প্যাপিরাসের পাতায় লিখতে শুরু করে। তারা প্যাপিরাসের পাতায় লিখে তা বই আকারে লম্বা কাপড়ের থানের মতো গুটিয়ে রাখত। সবচেয়ে বড়ো প্যাপিরাস পাতার বইয়ের দৈর্ঘ্য ছিল ১২০ ফুটের মতো। প্যাপিরাসের পাতায় লেখা বই একসময় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বলে রাখা ভালো, এই প্যাপিরাস শব্দ থেকেই ইংরেজি পেপার শব্দের জন্ম হয়েছে। অন্যদিকে চীন দেশের লোকেরা লেখার জন্য বাঁশের ফলক এবং কাপড় ব্যবহার করত। একসময় তারা কাপড়ের টুকরো, বাঁশ, গাছের ছাল একসাথে মিশিয়ে গুঁড়ো করে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম কাগজ তৈরি করে। চীনারা কাগজ তৈরির এই কৌশল অনেকদিন নিজেদের মাঝে গোপন রাখলেও তা প্রথমে আরবে এবং পরে ইউরোপ সহ অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। সর্বশেষ পনেরো শতকে জার্মানির জোহানেস গুটেনবার্গের আবিষ্কার করা মুদ্রণযন্ত্র বইয়ের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করে।

১৪৫৫ সালে গুটেনবার্গ বাইবেল গ্রন্থটিকে তার প্রেসে প্রথম ছাপেন। যা বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম ছাপা বইয়ের সম্মান পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে খুব দ্রুত সময়ের মাঝেই বই ছাপানোর এই প্রযুক্তি ইউরোপ থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে সব দেশেই পুস্তক আকারে বই মুদ্রিত হতে থাকে। গুটেনবার্গের মুদ্রনযন্ত্র আবিষ্কারের আগে বইয়ের দাম ছিল জনসাধারণের হাতের নাগালের বাইরে। সে সময় জার্মানি চার্চে রাখা বইগুলোকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। যেন কেউ চুরি না করতে পারে। কারণ একেকটি বইয়ের দাম ছিল জার্মানি শহরের একেকটা বাড়ির দামের চেয়েও বেশি। ■

প্রাবন্ধিক

জ্ঞানের পৃথিবী

সারমিন ইসলাম রত্না

রিংকুর আব্বু গম্ভীর হয়ে পত্রিকা পড়ছেন। এমন সময় রিংকু বলল, আব্বু আমাকে একুশের বইমেলায় নিয়ে যাবে? আব্বু অবাক চোখে রিংকুর দিকে তাকালেন! পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশু রিংকু। অথচ বই পড়ার প্রতি কত আগ্রহ। রিংকু বলল, কী দেখছ আব্বু? বলো না? মেলায় নিয়ে যাবে কি না? অবশ্যই নিয়ে যাব। আম্মু ঠোঁটে হাসি মেখে বললেন, আমাকে কিন্তু রান্নার বই কিনে দিতে হবে। আমি ভালো রান্না পারি না। রিংকু ভেংচি কাটল। সকালে, দুপুরে, রাতে সবসময় তুমিই তো রান্না করো আম্মু। ও তাই নাকি? আব্বু-আম্মু হাসলেন। আজ ছুটির দিন। রিংকু আব্বু-আম্মুর সঙ্গে বইমেলায় এসেছে।

বইমেলায় শিশুচত্বর নামে একটি জায়গা আছে। এখানে অনেকগুলো বইয়ের দোকান। রং-বেরঙের বই, রং-বেরঙের ছবি। রিংকু দেখল, ওর মতো আরো অনেকেই এসেছে। তাই মনে প্রশ্ন জাগল, আব্বু শিশুচত্বর মানে কী? আব্বু বললেন, শিশুচত্বর মানে হলো: শিশুদের গোল্লা। এখানে সব শিশুতোষ বই পাওয়া যায়। ঐ যে দেখ, তোমার মতোই ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ে বই কিনছে। রিংকু গাল ফোলাল, আমার বয়স পাঁচ বছর। আমি মোটেও শিশু না। আব্বু-আম্মু হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক আছে। এখন বই পছন্দ করো। রিংকু দশটি বই পছন্দ করল। আরেকটি বই খুব পছন্দ হলো রিংকুর। ভয়ে ভয়ে বলল, আম্মু এই বইটার দাম কত? রিংকুর আব্বু-আম্মুসহ উপস্থিত সবাই হেসে উঠল। দোকানদার বলল, দাম জেনে তুমি কী করবে বাবু? রিংকু চোখ রাঙাল, আমি মোটেও বাবু না। অনেকগুলো বই কিনেছি; সেজন্য জানতে চেয়েছি। আব্বু বললেন, এই বইটা তোমার। সব বই তোমার। রিংকু মহানন্দে বইমেলায় ঘুরতে লাগল।

হঠাৎ দেখতে পেল ওরই মতো একজন! ওর হাতে একটাও বই নেই। রিংকু এগিয়ে গেল। এই তুমি বই কেননি? বাচ্চা ছেলেটি মন খারাপ করে বলল, আম্মু আমার পছন্দমতো বই কিনে দেননি। ওর আম্মু রেগেমেগে বললেন, আমি যেগুলো পছন্দ করি সেগুলো তোমার ভালো লাগে না। রিংকু ব্যাগ থেকে দশটি বই বের করল। দেখো তো এগুলো তোমার পছন্দ হয় কী না? ছেলেটি উলটে পালটে দেখতে লাগল। বাহ! বইগুলো তো খুব সুন্দর। রিংকু বলল, পাঁচটি তোমার পাঁচটি আমার। রিংকুর আম্মু হাসি দিয়ে বললেন, আমরা বই কিনব। একে-অপরকে বই কিনে দেবো। বই উপহার দেবো। কারণ বই মানে জ্ঞানের পৃথিবী। ■

শিশু সাহিত্যিক ও বাচিকশিল্পী

বইপ্রেমী টুটুল

আমিরুল হক

ছোট্ট বেলা থেকেই টুটুলের বই পড়ার সখ। বই ছাড়া তার কিছুই ভালো লাগে না। বই যেন তার পড়ার সাথী, বই যেন তার প্রাণ। ইতোমধ্যেই বিখ্যাত বিখ্যাত জ্ঞানী, গুণী, মনীষী আর লেখকদের লেখা, আত্মকাহিনি পড়ে সে অনেক জ্ঞানার্জন করে। কোথাও কোনো কাগজের টুকরো দেখলে সেটাকে তুলে পড়বে। তার জানার অনেক আগ্রহ। কোথায় কি ঘটছে, কোথায় কি হচ্ছে আর কি হবে সেসব কিছু তাকে জানতেই হবে। অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা তার সবসময়ই। তাই প্রতিদিন খবরের কাগজের অপেক্ষায় সে বসে থাকে যেন তার তর সয় না। বই পড়ার নেশার জন্য সবাই তাকে বই পাগল বলে। বই হলো টুটুলের ধ্যান-জ্ঞান। পাঠ্যবই তার ঠোঁটস্থ। ক্লাসে টিচারের সামনে একেবারে প্রথম বেঞ্চে সে বসবে। নিয়ম শৃঙ্খলা সম্পর্কে টুটুল অনেক সচেতন। ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করে। শুধু ক্লাসে কেন, সমগ্র স্কুলেও সে সেরা।

কথাবার্তায়, চলাফেরায়, আচার-আচরণে টুটুল অত্যন্ত নম্র ভদ্র। স্বল্পভাষী। বড়োদের সাথে মাথা উঁচু করে কথা বলে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই আধুনিক যুগে টুটুলের মতো এমন বই পাগল সচরাচর দেখা যায় না। অত্যন্ত সহজ সরল প্রকৃতির ছেলে। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। মেধা মননে বড়োদের চাইতে সে অনেক ভালো জ্ঞান রাখে। এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র বই পড়ার জন্য। বই পড়তে পড়তে তার মধ্যে একটা অসাধারণ জ্ঞান ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে।

টুটুলরা তিন ভাই এক বোন। টুটুল সবার ছোটো। স্বভাব চরিত্রে অন্যান্য ভাইবোন থেকে সে একটু আলাদা। টুটুলকে কখনো বলতে হয় না টুটুল তুমি পড়তে বসো। টুটুলের জন্য তার বাবা মা নিশ্চিন্ত।

পরিবারের সবাই কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় যে যার ইচ্ছেমতো তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে

নেয়। কিন্তু টুটুলের বেলায় একটু আলাদা। সে যাবে একদম সাদামাটাভাবে তবে সাথে দুই একটা বই তো থাকবেই। যেখানেই যাক না কেন বই নিতে তার কখনো ভুল হয় না।

একদিন পরিবারের সবাই এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাবে। দুই একদিন থাকার প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা হয়। সেখানে গিয়ে সবাই আনন্দ আর হৈচৈ এ মেতে ওঠে। অনেক দিন পরে তো তাই আনন্দের স্বাদটাই ছিল একটু ভিন্ন। অনেকদিন পর দেখা সাক্ষাৎ হলে যা হয়। এত আনন্দ এত হৈ চৈ কিন্তু টুটুল সেখানে অনুপস্থিত। যাওয়ার সাথে সাথে টুটুল নিজেকে সবার থেকে আড়াল করে রাখে। সে নিরিবিলি একটা কামড়া বেছে নেয়। সেখানে গিয়ে বই পড়তে থাকে।

এদিকে আপ্যায়নের সময় তাকে না দেখে সবাই খুঁজতে থাকে। খুঁজতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিরিবিলি কামরায় তাকে বই পড়তে দেখা যায়। চাচাত ভাই রবিন তাকে বলে কি ব্যাপার টুটুল তুমি আমাদের বাসায় এলে কোথায় তোমাকে নিয়ে হৈ চৈ করব তা না তোমাকে খুঁজেই পাই না। ডাকছে তাড়াতাড়ি চলো। রবিন বলে আচ্ছা টুটুল তুমি বই পড়তে খুব ভালোবাসো তাই না? টুটুল উত্তরে বলে বই পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। আচ্ছা তুমি যে সারাক্ষণ বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকো তোমার একটুও খারাপ লাগে না? টুটল হেসে বলে বই পড়ে যে আনন্দ পাই অন্য কিছুতে অতটা আনন্দ পাই না। বই আমার পরম বন্ধু।

বই বন্ধুকে ছেড়ে আমি থাকতেই পারব না। টুটুলের মুখে এমন কথা শুনে তার চাচা বলেন বেশ তো ভালো কথা। বই তো অবশ্যই পড়বে। রবিন তো তোমার বই বন্ধুকে ছেড়ে থাকতে বলছে না। এবার আমার কথা শোন এক নাগারে বই পড়লে তোমার চোখে প্রেসার পড়বে। তখন মাথা ব্যথা করবে, যন্ত্রণা করবে। তাই বলছিকি তুমি বইও পড়বে, খেলাধুলা করবে, হাঁটাচলাও করবে। সবার সাথে হৈচৈ করবে মজা করবে তাহলে দেখবে তোমার খুব ভালো লাগবে। চাচার কথাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিল টুটুল।

একবার টুটুলের জন্মদিনে বিরাট আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথি, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী টুটুলের বন্ধুরা একে একে আসতে থাকে। সবার হাতে টুটুলের জন্য গিফটের প্যাকেট। অনুষ্ঠান শেষে সবাই চলে যাবার পর বাড়িতে সবাই গিফটের প্যাকেটগুলো খুলে দেখে। সবাই খুশি। সব শেষে একটা প্যাকেটে দু'খানা বই পাওয়া যায়। বই দু'খানা পেয়ে টুটুল তো বেজায় খুশি। অন্যান্য গিফ্‌ট পেয়ে যতটা খুশি তার চাইতে বেশি খুশি বই পেয়ে।

বইপ্রেমী টুটুল প্রতিবছর বাবাকে সাথে করে একুশের বইমেলায় যায়। স্টলে স্টলে ঘুরে নিজের পছন্দের বই কেনে। বই কিনেই ক্ষান্ত হয় না। মেলায় আসা নামকরা বড়ো বড়ো লেখকদের সাথে দেখা করে তাদের কাছ থেকে অটোগ্রাফ সংগ্রহ করে। বইমেলায় আসাটা যেমন সখ তেমনি অটোগ্রাফ সংগ্রহ করাটাও তার আরেকটা সখ।

টুটুলের বাবার কাছে প্রখ্যাত একজন লেখক টুটুলের বই পড়ার নেশার কথা জানতে পেরে টুটুলকে আদর করে বলেন সত্যিই আমি খুব খুব খুশি হয়েছি। বইকে তুমি এত ভালোবাসো যে, বই ছাড়া তুমি কিছু বোঝ না। তোমার মতো এমন বই পাগল সমাজে খুবই দরকার। মনে রাখবে বই জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে। জ্ঞান আহরণের জন্য বইয়ের চেয়ে ভালো আর কিছু নেই। বই আত্মচেতনাবোধ জাগিয়ে তোলে। উদার হতে সাহায্য করে। বইয়ের চেয়ে উৎকৃষ্ট বন্ধু আর কি হতে পারে বলো? বই চিত্তকে প্রফুল্ল রাখে। যত পড়বে তত শিখবে। যত শিখবে তত জ্ঞান বাড়বে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমার এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তুমি অনেক বড়ো হতে পারবে। মনে রাখবে জ্ঞানার্জনে বইয়ের কোনো বিকল্প নাই। এই গুণী লেখকের মুখে এমন সুন্দর সুন্দর কথা শুনতে পেরে টুটুল নিজেকে ধন্য মনে করে। ■

সাবেক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বেতার

গল্প

মাতৃভাষার মায়া

ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান

রেস্টুরেন্টে ঢুকেই ডাক্তার সাহেব মাসুমকে ডাকলেন। এক কাপ চা খাবেন। মাসুম ছুটে এল। ডাক্তার সাহেব চায়ের অর্ডার দিলেন। মাসুম রেস্টুরেন্টের সবচেয়ে ছোট্ট বয়। ছোট্ট হওয়ায় সবাই ওকে পিচ্চি ডাকে। সবাই পিচ্চি ডাকলেও ডাক্তার সাহেব পিচ্চি বলে কখনো ডাকেন না। ওনার মতে বাচ্চাদের পিচ্চি ডাকা উচিত নয়। পিচ্চি ডাকলে বাচ্চাদের অসম্মান করা হয়। ছোটোদের পিচ্চি ডাকা একধরনের অভদ্রতা। ভদ্রতা অভদ্রতা ছোটোরাও বোঝে। ছোটোদেরও আত্মসম্মানবোধ আছে। মাসুমকে আদর করেন তিনি। মাসুমের বয়স সাত কি আট বছর হবে। ফুটফুটে ফর্সা চেহারা। খুব মায়া লাগে। মনে হয় কোনো বড়োলোকের ছেলে। বড়োলোকের ছেলে হলে কি রেস্টুরেন্টে কাজ করত? কখনও না। নিশ্চয় কোনো কেজি স্কুলে পড়ত। ইংরেজি শিখত। মাসুম ইংরেজি না জানলেও ভালো বাংলা বলতে পারে। বাংলা তো মায়ের ভাষা। মায়ের কোলে যে ভাষা শেখা হয় সেটাই মায়ের ভাষা। সেটাই মাতৃভাষা।

ডাক্তার সাহেবের টেবিলে চা এল। কিন্তু মাসুম আসেনি। এল অন্য একটি ছেলে। বয়সে টগবগে যুবক। এই যুবক যে নতুন এসেছে তা সহজেই বুঝতে পারলেন। তিনি রেস্টুরেন্টের নিয়মিত চায়ের কাস্টমার। বাজারের নামকরা ঔষধ ব্যবসায়ী। একজন ফার্মাসিস্ট। প্রাথমিক চিকিৎসক। ডাক্তার হিসেবে সবার কাছে প্রিয়। চায়ের কাপে চুমুক

দিয়েই ওই যুবককে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম কি? যুবকটি কাঁচা হিন্দি ভাষায় উত্তর দিলো, 'মেরা নাম হানিফ।' বাড়ি কোথায়? যুবক ছেলেটি বলল, 'মেরা মোকাম বাংলাদেশ।'

ডাক্তার সাহেব কিছুটা অবাক হলেন! যুবকটি সম্পর্কে জানার আরো কৌতূহল বাড়ল। চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে হানিফের সাথে আরো কথা হলো। হানিফ হিন্দির সাথে বাংলা মিশিয়ে কথা বলে। শুনতে কিছুটা উর্দুর মতো শোনায়।

হানিফ বলল, তার বাড়ি বাংলাদেশে। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সে অনেক ছোট্ট ছিল। বাবা মায়ের সাথে ভারতে চলে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আর তারা দেশে ফিরে আসেনি। হানিফ বড়ো হয়ে জানতে পারে দেশে তাদের জমিজমাও, বাড়িঘর আছে। বর্তমানে এসব অন্যরা ভোগ করছে। এসবের একটা হদিস খুঁজে পেতেই ওর বাংলাদেশে আসা। প্রাথমিক অবস্থায় থাকা খাওয়ার জন্য রেস্টুরেন্টে কাজ নেওয়া।

ফেব্রুয়ারি মাস। সামনে মহান শহিদ দিবস। চারদিকে বাজছে দেশের গান। বাজারে বেশ কয়েকটি ক্যাসেটের ঘর। এই দোকানগুলোর সামনে বড়ো বড়ো সাউন্ডবক্স। জোরেশোরে বাজছে দেশাত্মবোধক গান। বারবার শোনা যাচ্ছে, 'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা...।' 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...।'

ডাক্তার সাহেবের বার বার মনে পড়ছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। ভাষা শহিদ সালাম, জব্বার, বরকত, রফিক, সফিক ভাইদের আত্মত্যাগের কথা।

দুপুরবেলা। ফার্মেসিতে মন বসছে না। রোগী আর কেনাবেচা কম। ডিসেম্বর জানুয়ারিতে ঔষধের ব্যবসা মন্দা থাকে। বছরের শেষ আর শুরুর দিকটায় বাৎসরিক হিসাব-নিকাশ। হয়ত মানুষের হাতে টাকা-পয়সা কম থাকে। এবার ফেব্রুয়ারি মাসেও ব্যাবসা ভালো নয়। তাছাড়া শীতকাল। শীতকালে মানুষের অসুখবিসুখ কম হয়। প্রচুর শাকসবজি পাওয়া যায়। তবে বাচ্চাদের জন্য ভয় বেশি। ওদের ঠান্ডা লাগার ভয় থাকে। মাসুমকে একটা শীতের জামা কিনে দিয়েছেন তিনি।

ফার্মেসির পাশেই বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা অফিসের একটি শাখা। স্থানীয় একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের সাথে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকর্মী বসে গল্প করছেন। গল্প মানে, দেশের কথা। দশের কথা। সমাজের কথা। জাতির কথা। হঠাৎ হানিফ মাসুমকে কোলে নিয়ে ফার্মেসির দিকে ছুটে আসছে। মাসুমের সারা শরীরে রক্ত। ডাক্তার সাহেব দৃশ্যটি দেখে চেম্বারে এসে বসলেন। হানিফ এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'ডাক্তার ছাব, আমারা পিচ্চিকো দেখলো।' ডাক্তার বললেন, কী হয়েছে? হানিফ বলল, 'দু মাস্তান আদমি আমারা পিচ্চিকো মারা।' ডাক্তার বললেন, তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাও।

ডাক্তার সাহেব মাসুমকে দেখেই বুঝতে পারলেন, ওর আঘাতটা মাথায়। এত রক্ত মাথা থেকেই ঝরছে। মাথার কিছু জায়গা ফেটে গেছে। রক্তঝরা বন্ধ হচ্ছে না। মাসুমের গায়ের মোটা কাপড়ের শার্টটি দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।

মাসুমের এই অবস্থা দেখে ফার্মেসির সামনে অনেক লোক জড়ো হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা অফিসে যারা বসা ছিলেন তারাও বেশ তৎপর হয়ে উঠলেন। ডাক্তার সাহেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন বাচ্চাটিকে হাসপাতালে পাঠান।' হানিফও ডাক্তারের কথায় নিজেকে যোগ করে। সবাইকে অনুরোধ করে হানিফকে বলছে, 'হে মেরা ভাইয়ে, দেখো, এ পিচ্চিকো পাছ কুই নেহি। এ পিচ্চিকো হাসপাতাল লিয়ে যাও।'

একদিকে রক্ত। অন্যদিকে হানিফের ভিনদেশি ভাষায় কথা শুনে, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রেগে গেলেন!

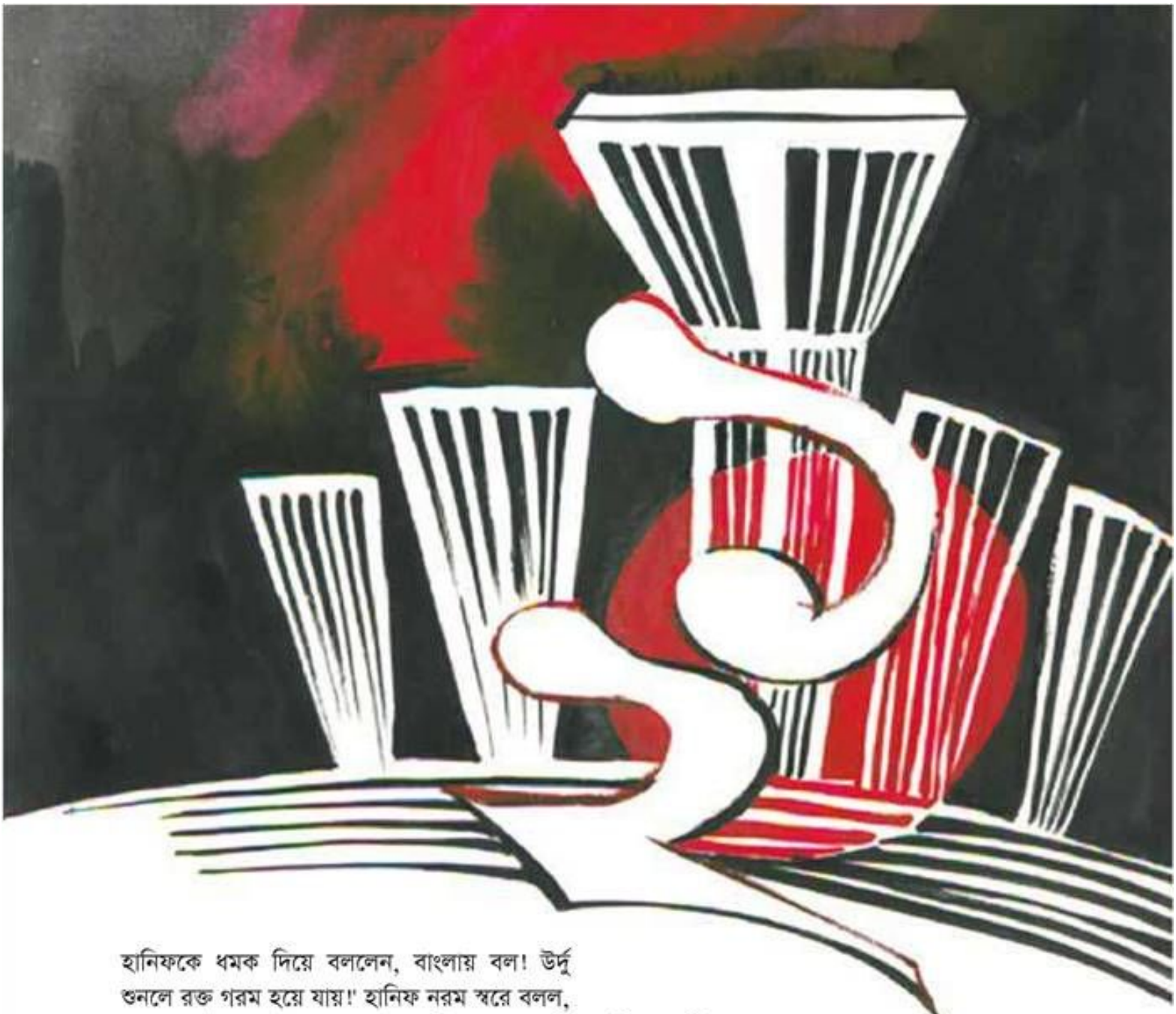

হানিফকে ধমক দিয়ে বললেন, বাংলায় বল! উর্দু শুনলে রক্ত গরম হয়ে যায়!' হানিফ নরম স্বরে বলল, 'আরে ভাইছাব, মে বাংলা মালুম নেহি। মে কেয়াছি বাতাতি হে?' কমান্ডার সাহেব হানিফের উপর আরো চড়াও হয়ে গেলেন! জাড়ো হওয়া কিছু লোক আবার হানিফের পক্ষ হয়ে কথা বলতে শুরু করল। পরিবেশ উত্তেজিত হতে শুরু করে। ডাক্তার সাহেব মাঝে পড়লেন। সাবইকে অনেক চেষ্টা করে শান্ত করালেন। পরিবেশ কিছুটা শান্ত। স্থানীয় দুই তিনজনকে সঙ্গে দিয়ে মাসুমকে হাসপাতালে পাঠালেন। এর মাঝে দুই পক্ষের তর্ক-বিতর্কের এক ফসলা ঝড় হয়ে গেল।

পুরু ব্যাপারটা ডাক্তার সাহেবকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। হৃদয় সিক্ত হলো, মাতৃভাষার প্রতি মানুষের মায়া দেখে। ভাষা শহিদ সালাম, জব্বার, বরকত, রফিক, সফিকের আত্মদান স্মরণ করে, মাতৃভাষার মায়ায় আগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। মনে মনে ধিক্কার দেন তাদেরকে, যারা বাংলা মায়ের সন্তান হয়েও অন্তর দিয়ে আজও উর্দুকে ভালোবাসে। আবার মাতৃভাষার প্রতি বাঙালির অকৃত্তিম ভালোবাসা দেখে, গর্বে ভরে গেল বুক।

মাতৃভাষার মায়ায় মৌন ডাক্তার সাহেব হঠাৎ সম্বিত ফিরে পান। তখনও ক্যাসেট ঘরগুলোতে বাজছিল, 'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা...।' 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...।' ■

ছড়াকার ও শিশু সাহিত্যিক

গল্প

প্রভাতফেরি

উৎপলকান্তি বড়ুয়া

সবাই ঘুম থেকে উঠে গেছে। দীপু, রানু, সোমা, দিনা সবাই। সুমি আরেকটু আগেই বাবার সাথে উঠেছে। সুমি ঘুমোয় বাবারই সাথে। সেও যাবে প্রভাতফেরিতে বাবা, দীপু , রানু, সোমা ও দিনার সাথে। গতকাল রাতে যখন শহিদমিনারে প্রভাতফেরিতে যাওয়ার কথা হচ্ছিল, তখনই সুমি বলে বসে,

-আমিও যাব শহিদমিনারে ফুল দিতে প্রভাতফেরিতে। বাবা প্রথমে না করেছে।

- ছোট্ট তুমি। হাঁটতে পারবে না।

-না, আমি যাব। সবাই যাচ্ছে, তাই আমিও যাব। সবাই যেতে পারে, আমিও যাব।

এবার ক্লাস টুতে ভর্তি হয়েছে সুমি। সকলের ছোটো বলে তার আবদার সবার কাছে, একটু বেশি । ছোট্ট মেয়ে সুমিকে যে থামানো যাবে না সে কথা বাবা ভালো করেই জানেন। কি আর করা! বাবা রাজি হন।

-আচ্ছা বাবা, প্রভাতফেরি কী? সুমি হঠাৎ বাবাকে প্রশ্ন করে।

বাবা পাঞ্জাবি পরছিল। ডান হাতের হাতা গুটাতে গুটাতে সুমির প্রশ্ন শুনে থেমে যান বাবা। তারপর বলেন, বাহ্ সুমি মা আমার! সুন্দর প্রশ্ন করেছ তো! শোনো দীপু, রানু, সোমা, দিনা- এই দিকে এসো। তোমরাও শোনো। সুমি প্রশ্ন করেছে-প্রভাতফেরি কি? না জেনে থাকলে তোমরাও জেনে নাও। রানু ও সোমা একই সাথে বলে ওঠে,

-হ্যাঁ ছোটো কাকু আমিও জানি না তো। প্রভাতফেরি অর্থ কি?

দীপু ও দিনা চুপ থাকে। তারাও পাশে এসে দাঁড়ায়।

-সংক্ষেপে বলি শোনো। তখন আমাদের এই বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন করত। পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার যখন উর্দু ভাষাকে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দিতে চাইল তখন কেউই এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হলো না। বাবা বলতে শুরু করেন।

-তখন শুরু হয় আন্দোলন। তীব্র থেকে তীব্রতর। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের থামিয়ে দিতে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। এতে বরকত, সালাম, রফিক, শফিক, জব্বারসহ নাম না জানা আরো অনেক শহিদের রক্তে সেদিন ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল। চিন্তা করা যায়! সেদিন বাঙালি শুধু বুকের রক্ত ঢালেনি গৌরবের ইতিহাসও রচনা করেছিল। তোমরা তো সবাই ছোটো এখনও। আরো বড়ো হও। তখন আরো বিস্তারিত জানবে, শুনবে এবং বুঝতে পারবে।

-আচ্ছা বাবা, প্রভাতফেরি কি! সে তো বললে না।

- সুমির যেন তর সইছে না। বাবাকে আবারও প্রশ্ন করে।

-হ্যাঁ বলছি। ১৯৫২ সালের এই দিনে মায়ের ভাষার জন্য প্রাণ বিলিয়ে দেওয়া এই শহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানো হয় ফুল দিয়ে। স্মরণের বেদি শহিদমিনারে। শহিদমিনারে দিনের প্রথম প্রহরে, মানে কাক ডাকা ভোরে ফুলের তোড়া, ফুলের গুচ্ছ হাতে খালি পায়ে শ্রদ্ধা জানাতে, স্মরণ করতে যাওয়ার নামই প্রভাতফেরি। সাথে মহান শহিদদের স্মরণে শ্রদ্ধাভরে একই সাথে সুর করে একই শোকসংগীত গেয়ে ওঠে সকলে–আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে ফেব্রুয়ারি / আমি কি ভুলিতে পারি? এই সবটা মিলেই প্রভাতফেরি। বুঝলে সুমি মা আমার! দীপু, রানু, সোমা ও দিনার প্রতিও উদ্দেশ্য করে বলে বাবা,

- তোমরাও নিশ্চয়ই বুঝেছ!

-তোমরা কি বেরুবে? নাকি এখনও গল্প করবে? কখন যাবে প্রভাতফেরিতে। সময় কত হলো খেয়াল আছে? - ভেতর থেকে মা এসে তাগাদা দেন।

-হ্যাঁ চলো চলো, আর দেরি নয় একবিন্দুও। এ সম্পর্কে পরে আরো বিস্তারিত তোমাদের জানাবো, আগে চলো প্রভাতফেরিতে যাই। বলেই বাবা ফুলের তোড়াটা হাতে তুলে নেন। সুমি, দীপু, রানু, সোমা ও দিনা তারা প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে আনা গোলাপফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়ে বাবার পেছন অনুসরণ করে। এরপর খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ফুলেল শ্রদ্ধা হাতে বাবার সাথে সমস্বরে গেয়ে ওঠে – আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি / আমি কি ভুলিতে পারি? ■

শিশু সাহিত্যিক

বকুল সৌরভ

নাসীমুল বারী

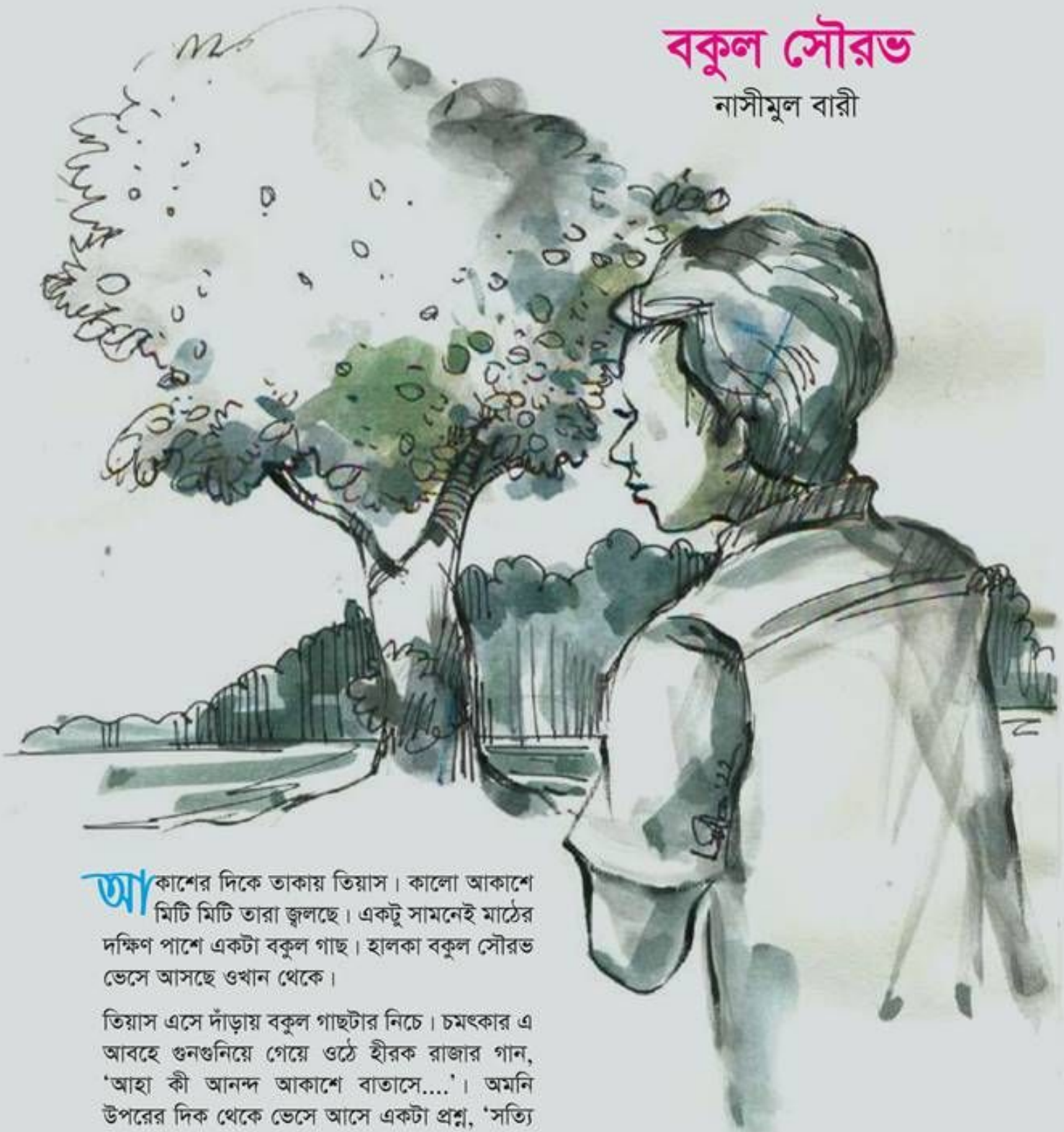

আকাশের দিকে তাকায় তিয়াস। কালো আকাশে মিটি মিটি তারা জ্বলছে। একটু সামনেই মাঠের দক্ষিণ পাশে একটা বকুল গাছ। হালকা বকুল সৌরভ ভেসে আসছে ওখান থেকে।

তিয়াস এসে দাঁড়ায় বকুল গাছটার নিচে। চমৎকার এ আবহে গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে হীরক রাজার গান, 'আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে....'। অমনি উপরের দিক থেকে ভেসে আসে একটা প্রশ্ন, 'সত্যি কি আনন্দ পাচ্ছ?'

'কে প্রশ্ন করল?' ভাবছে আর গাছের দিকে তাকাচ্ছে। মোবাইলের লাইট দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে- কে কথা বলল। হঠাৎ দেখে মূল কাণ্ডের বড়ো বকুল শাখাটি নড়ে উঠল। সাথে সাথে আওয়াজ এল, আমি জানতে চেয়েছি।

-তুমি! কে তুমি?

-আমি বকুল। এই যে সৌরভ পাচ্ছ, তা আমারই সৌরভ; বকুল সৌরভ।

-অ, আচ্ছা।

-আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না তো?

-তোমার প্রশ্ন! আমি যদি আনন্দে না থাকি, তবে কি গান গাচ্ছি?

-না, আনন্দে নেই তোমরা।

-মানে? আমি আনন্দে আছি কি নেই, তা তুমি জানবে কেমনে?

-জানি। জানি বলেই বলছি, আনন্দে নেই তুমি। নেই বরকত, নেই শফিক, রফিক, সালামও। আনন্দে নেই কাসেম স্যারও। আনন্দে নেই...

-থামো থামো, পুরনো কথা বলতে হবে না। ওরা সবাই মরে গেছে।

-ভালো কথা, তুমি তো বেঁচে আছ? তুমি কি সত্যি আনন্দে আছ?

-আলবৎ।

বকুল শাখাটি এবার মলিন কণ্ঠে বলে– ঠিক বলেছ। ওরা নেই বলেই তোমরা আনন্দে আছ।

অমনি তিয়াস বিরক্ত নিয়ে বলে- কী বলছ যা-তা?

-সহজ। তোমরা অনেক সাধারণ শব্দকেও তাড়িয়ে দিয়েছ। এই যেমন– অতি প্রচলিত, চেনা ও সাধারণ শব্দ 'ঘোষক' ও 'শ্রোতা'কে বানিয়ে ফেলেছ 'জকি' ও 'লিসেনার'। আর এই যে তুমি বললে 'আলবৎ'। এভাবে তোমাদের ব্যবহৃত বদলানো শব্দগুলো কি তোমার মা বলত? বাবা বলত?

-কেন এমন শব্দে কী সমস্যা? তুমি কি বুঝতে পারো না? রেডিওতে 'জকি' বা 'লিসেনার' বলে। এটা তো ব্রডকাস্টিং এরিস্টোকেসি ব্যাপার-স্যাপার। ব্রডকাস্টে 'ঘোষক'-'শ্রোতা' বেমানান।

-হা হা হা অভিজাত ছেড়ে তোমরা এরিস্টোকেসি

খুঁজে বেড়াও। মানান-বেমানান খুঁজে বেড়াও। বাংলাদেশ বেতার যে 'শ্রোতা' বলে,

-দেখ আমার রাগ চড়াবে না।

-কেন? আমি কী করলাম? একটু পরই তো বলবে বকুল খুশবুটা ফাইন। কিংবা বলবে তোমার স্মাইলটা ফ্যানটাসটিক। তাই না? তোমার ভাষা অভাবে পড়ে গেছে। তাই এখন শব্দ ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছ।

মেজাজটা বিগড়ে যায় তিয়াসের। এত বড়ো কথা। ভিক্ষে করছি। না, আর থাকব না এ বকুল তলায়। আর নিব না বকুল সৌরভ।

হাঁটা ধরেছে অন্যদিকে। কিন্তু বকুল সৌরভ তো পাচ্ছে। নাক চেপে ধরে। না, বেশিক্ষণ পারে না ওভাবে। দম আটকে যায়। অনেক দূর এসে গেছে, এখনো বকুল সৌরভ ভেসে আসছে। আবার নাক চেপে ধরে। হঠাৎ দেখা হয় হিমাদ্রির সাথে। হিমাদ্রি বলে, কী ব্যাপার তিয়াস! নাক চেপে হাঁটছ কেন?

-বকুল সৌরভ নেব না, তাই।

অট্টহাসি দিয়ে হিমাদ্রি বলে– তুমি নাক চাপলেও কি ওই বকুল সৌরভ বিলীন হয়ে যাবে? মোটেই না। আবার বকুল কাউকে দেবে, কাউকে দেবে না- এভাবেও আলাদা সৌরভ ছড়ায় না।

হিমাদ্রির এ কথায় তিয়াস বলে- দেখো মেজাজটা ভালো না।

-কেন, কী হয়েছে?

-দা এনে এখনই বকুল গাছটা কেটে ফেলব। বলে আমি নাকি ভিক্ষা করি।

-তুমি ভিক্ষা করো! মানে! বকুল এভাবে বলেছে? না, বকুল তো তেমন না। বকুল সৌরভ তো সবার জন্য অবারিত। তুমি সৌরভ ভিক্ষে করতে যাবে কেন?

-সৌরভ না; শব্দ। ওর কথার কী অহঙ্কার!

-শব্দ! কী হয়েছে ঠিক করে বলো তো।

-সে বলে আমি, আমরা নাকি শব্দ ভিক্ষা করি।

-তাই বুঝি! চলো গিয়ে জিজ্ঞেস করি; কেন এসব বলছে?

-আমি দা এনে নেই আগে। আজই কেটে উপড়ে ফেলব বকুলটারে।

-ওই বকুল একটা কথা বলবে, তুমি হিংস্র হয়ে দা আনবে। তাহলে তো দুজনেই এক হয়ে গেলে। তোমাকে তো সেরা হতে হবে। তুমি না সৃষ্টির সেরা। চলো আমিও যাই।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে আসে বকুল তলায়। এখনো বকুল সৌরভে ভরে আছে এ জায়গাটা। হিমাদ্রি বলে দারুণ!

বকুল শাখাটা আবার নড়েচড়ে বলে– এসেছ আবার?

-কেন তোমার সমস্যা আছে?

একটু মেজাজ নিয়ে তিয়াস বলে। সাথে সাথে হিমাদ্রি বলে- কী হয়েছে বকুল?

-এখানে এলে যে! আমি তো শব্দ ভিক্ষা দেই না। আমি নিজেই শব্দ, নিজেই ব্যবহৃত হই তোমাদের জন্যে গান, কবিতা, আনন্দে!

একটু থমকে দাঁড়ায় হিমাদ্রি! তিয়াসেরও মেজাজ বাড়ে। নিজেকে একটু সামলে হিমাদ্রি আবার জিজ্ঞেস করে- ব্যাপারটা কী?

-এই যে আমি যুগ যুগ ধরে তোমাদের সৌরভ দিচ্ছি। আমি কি কখনো 'খুশবু' বা 'স্মাইল' হয়েছি এ বাংলায়, এই বাংলার ভাষায়? আমার সৌরভ ছড়ানো কি 'ফেনটাসটিক' হয়েছে? কিংবা আমি কি আমার সত্তা এই সৌরভকে বাদ দিয়ে অন্য ফুলের সৌরভে আভিজাত্য খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাদেরকে দেবার জন্যে?

হিমাদ্রি চুপচাপ ওর কথা শুনছে।

বকুল আবার বলে –তোমাদের এমন কাজের জন্য কি সাতচল্লিশে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ভাষা রক্ষার জন্যে? আটচল্লিশে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার চুক্তি হয়েছিল? কার্জন হলের পুকুর পাড়ে গোপন বৈঠক বসেছিল? বায়ান্নের একুশ জন্ম নিয়েছিল? তোমাদের রক্ত আলপনা এঁকেছিল রাজপথে?

হিমাদ্রি এবার বকুলকে জিজ্ঞেস করে– 'খুশবু' বা 'স্মাইল' এসবে কি ভাব প্রকাশ পায় না?

তিয়াস রাগে ফুলছে। এবার মেজাজটা আরো চড়িয়ে বলে- দেখো এখনো কী সব কথা বলে। কত অহঙ্কার বকুলের! এ জন্যই দা-টা আনতে চেয়েছিলাম। এক কোপে শেষ করে দিতাম।

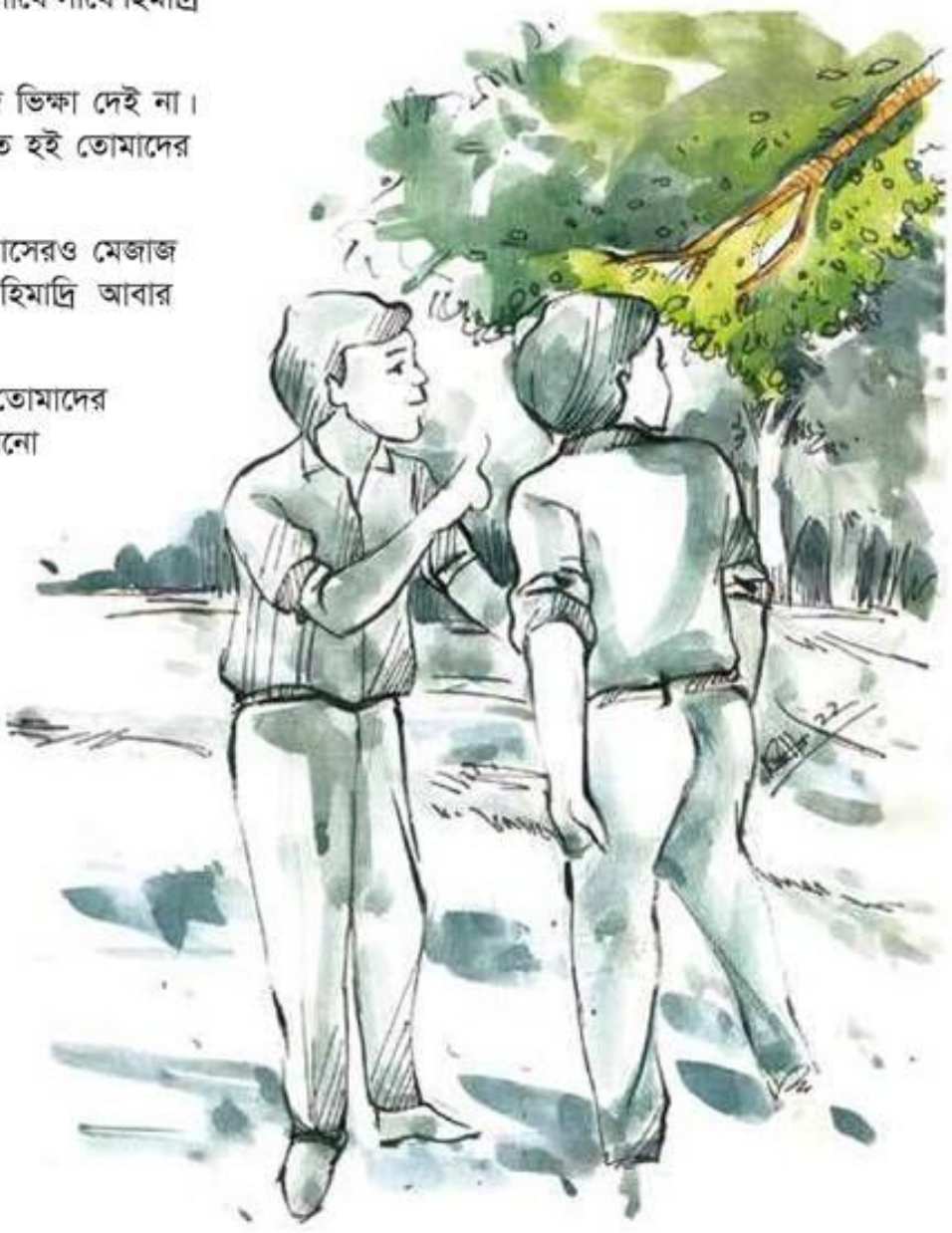

হা হা হা। হেসে ওঠে বকুল। তারপর শান্তভাবে বলে– নিজেকে বাদ দিয়ে অন্যের মাঝে কোনো আভিজাত্য নেই।

হিমাদ্রি তিয়াসকে বলে– থামো। আমি বকুলের সাথে কথা বলতেছি তো। আচ্ছা বকুল বলো, এতে কি ভাব প্রকাশ পায় না?

-না, আমি তা বলছি না। তোমার বাংলা শব্দ অনেক অনেক আছে। সমৃদ্ধও। অপ্রয়োজনে বাংলা শব্দ বাদ দিয়ে অন্য শব্দ এনে ব্যবহার করার দরকার তো নেই। কাব্যে-সাহিত্যে, ভাব-ছন্দের প্রয়োজনে কিছুটা ব্যবহার হতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক কথায় কেন এসব? সামাজিক আচরণে কেন এসব?

হিমাদ্রি দাঁড়িয়ে ভাবছে। ভাবতে ভাবতেই বলে- মন্দ বলোনি।

বকুল আবার বলে, এখনকার সময় তোমাদের বড়ো বড়ো যে-কোনো অনুষ্ঠানের বাংলা ঘোষক কী পরিমাণ অ-বাংলা শব্দ ব্যবহার করে, ভেবেছ? আর তোমাদের এফএম রেডিওর অনুষ্ঠানগুলো! তার মানে কি বাংলা ভাষা মন্বন্তরে ভুগছে?

তারপর উপরের দিকে তাকিয়ে হিমাদ্রি বলে, তুমি ঠিক বলেছ বকুল। আমি যেখানে সম্পূর্ণ, সেখানে কেন অন্যের কাছে হাত পাততে যাব।

হালকা বাতাস বয়ে যায়। বাতাসে বকুল সৌরভ যেন আরো একটু বেশি সুবাসিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। হিমাদ্রি অনুচ্চস্বরে তিয়াসকে বলে– আমরা মনে হয় রক্তে কেনা ভাষাকে কলুষিত করে তুলছি। এ দায় আমাদেরই।

ঠিক তখনই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে অনেক বকুল।■

শিশু সাহিত্যিক

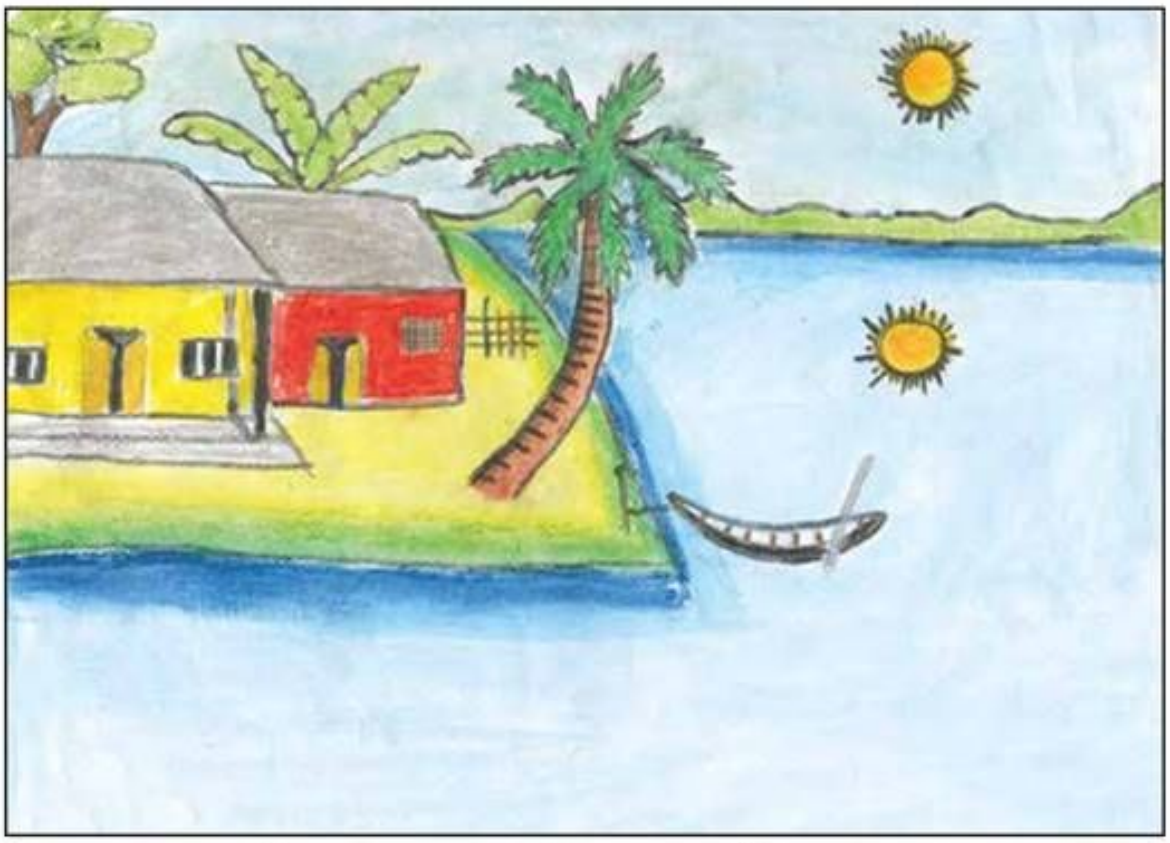

তাসিন মুমস্বাদ, চতুর্থ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর: সপ্তম পর্ব]

অপারেশন দিয়াড়া

ভোগের বিলের কোলঘেঁষা শেখের বাথান গ্রামে আমরা আশ্রয় নিলাম। রাত আটটা নাগাদ সাইদের গ্রুপও এলো। গ্রামের স্বেচ্ছাসেবক ভাইয়েরা গোপনে আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। আত্মীয় পরিচয়ে দুজন করে দশটি বাড়িতে উঠেছি। তোমরা হয়ত প্রশ্ন করতে পারো বিশজন অচেনা তরুণ একটা গ্রামের দশটি বাড়িতে আচমকা অতিথি হয়ে এলো আর কেউ কিছু বুঝল না বা আমরা কারো প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম না! ঠিক তাই। কিন্তু হলো না জমির ভাইয়েরই কারণে। কেননা, এসব গ্রাম আর বাড়িগুলো তো জমির ভাইয়ের সিলেক্ট করা। এখানকার অধিকাংশ লোকই জয় বাংলার সমর্থক। তাছাড়া, আমরা তো এক জায়গায় দুদিনের বেশি থাকছি না। তাই এই কদিনে কোনো সমস্যাই হয়নি; বরং আদর আপ্যায়নে আমরা বেশ আছি।

যাক সে-কথা। খাওয়াদাওয়ার পর আমরা সবাই ভোগের বিলের বেশ খানিকটা ডাউনে এক জায়গায় হলাম। তখন আমরা কালভার্ট অপারেশনের কথা সাইদদের বললাম, আর সাইদ বলল দিয়াড়া অপারেশনের কথা। সাইদের মুখে শোনা সেই কাহিনিই এখন আমি তোমাদের কাছে বলব। তার আগে দিয়াড়া গ্রামের ভূ-অবস্থান সম্পর্কে তোমাদের একটু ধারণা দিই। গ্রামটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা– মাইল দেড়েকের কম হবে না। এর তিন দিকে বিল, যা বর্ষায় থইথই করে। এক দিকে মাত্র সমতল– সরু লেজের মতো লম্বা হয়ে কয়ালখালি-রায়পুরের দিকে গেছে। বর্ষাকালে গ্রামটিকে ব-দ্বীপের মতো মনে হয়। তিন দিকে থইথই পানির সমুদ্র, সেই পানির সাথে পাল্লা দিয়ে আমন ধানের গাছগুলো মাথা তুলেছে উপরের দিকে; যেন ওরা বর্ষার পানির কাছে কোনোভাবেই হার মানবে না। আসলে ওরা প্রতি বছরই এভাবে বর্ষার পানির সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে, আর পৌষ-মাঘ মাসে সোনালি ধান হয়ে কৃষকের গোলায় ওঠে। তবে এ বছর বৃষ্টি অনেক বেশি হওয়ায় পানির পরিমাণ বেশি।

তাই ধান গাছগুলোকে ঢেউয়ের সাথে লড়াইও করতে হচ্ছে বেশি। তবু তারা লড়াকু মুক্তিযোদ্ধাদের মতো প্রাণপণ লড়াই করে মাথা উঁচু করে আছে পানির ওপরে। কোথাও আবার খালি জমি, সেখানে অজস্র শাপলা গাছ– গ্রামের মানুষেরা বলে না'ল। অজস্র শাপলা ফুল ফুটে আছে। পাড়ের কাছাকাছি এলাকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি পাটখেত। পানির সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য পাটগাছগুলোও হয়েছে লম্বা আর পুরুষ্ট। পানির তিন চারহাত উঁচু পর্যন্ত উঠে গেছে পাট গাছগুলোর মাথা। তারা বাতাসে দোলে হালকা চালে, কিন্তু পানির মধ্যে ডুবে যায় না।

এমনি চমৎকার জল থইথই সমুদ্রের মাঝে বর্ষাকালে দিয়াড়া গ্রামকে মনে হয় গাছগাছালি ভরা এক সবুজ দ্বীপ, দেখতে ভারি সুন্দর আর মনকাড়া। গ্রামের মানুষেরা সেই পানিতে ছোটো নৌকা ও ডোঙ্গা ভাসায়, বিলে জাল পেতে কই, শিং-মাগুর, শোল-বোয়াল এমনি নানা ধরনের মাছ ধরে। অনেকে ডোঙ্গা নিয়ে বিলে আসে শাপলা তুলতে।

সেদিনও দিয়াড়া গ্রামের অনেকেই বিলে গেছে মাছ ধরতে, শাপলা তুলতে। এদের মধ্যে দুটি কিশোরের কথা বিশেষভাবে বলতে হবে। তারা দুজনই শাপলা তুলতে এসেছে– শাদা চোখে তাই মনে হবে; কিন্তু আসলে ওরা সাইদদের গুপ্তচর। ওদের একজন ক্লাস সেভেনের ছাত্র মমিন আর অন্যজন হলো তারই সহপাঠী ইদ্রিস– দুজনই রায়পুর হাইস্কুলের ছাত্র। এরা সাইদের গ্রুপের বিচ্ছু আতিকের চাচাত ভাই। ওরা শাপলা তুলছে আর রসুনের ছিলার মতো পাতলা ছাল ছাড়িয়ে কচকচ করে শাপলার নরম ডাঁটা চিবোচ্ছে। তবে ওদের চোখ রয়েছে বিলের পুব দিকে, যেদিক দিয়ে রাজাকারদের নৌকা আসবে লুট করতে। কথা রয়েছে– দূর থেকে রাজাকারদের নৌকা দেখতে পেলেই মমিন আর ইদ্রিস ডোঙ্গা বাওয়া বৈঠা উপরে উঁচু করে তুলে ধরবে। সেই সংকেত লক্ষ করবে পাড়ের কাছে থাকা আরেক কিশোর অতুল। সে কূলের কাছাকাছি অল্প পানিতে শামুক ধরছে রাজহাঁস দুটোকে খাওয়াবে বলে। দেখে কেউ তাদের মুক্তির চর বলে ভাবতে পারবে না।

তখন সকাল নয়টা কী সাড়ে নয়টা। পুব দিক থেকে দুটো নৌকা আসতে দেখা গেল বেশ খানিকটা দূরে থাকতেই। নৌকায় পাল খাটানো। ওপরে পত পত করে উড়ছে চাঁদ–তারা-খচিত পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা। দেখলেই বোঝা যায়– এরা বাংলাদেশের পক্ষের কেউ নয়; পাকিস্তানের দালাল বা শত্রুদের কেউ। মমিনদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, রাজাকারদের নৌকা এটি। মুহূর্তে দুজনের বৈঠা ওপরে উঠে যায়। সংকেত পেয়েই অতুল দৌড় দেয় গ্রামের দিকে। সেদিকেও পরিকল্পনার ছক সাজানো। কাছের আমতলায় ছি-কুতকুত কিংবা গোল্লাছুট খেলছে কয়েকজন বাচ্চা ছেলেমেয়ে। অতুলকে দৌড়াতে দেখেই তাদের খেলা থেমে যায়– আসলে ওরা তো সত্যি সত্যি খেলছিল না; খেলার ছলে গোয়েন্দাগিরির দায়িত্বে আছে সাইদের গ্রুপের পক্ষে। ওদের এমনভাবে ট্রেনিং দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কেউ বুঝবে না ওরা খেলা ছাড়া আর কিছু করছে। অতুলকে দেখেই বাচ্চারা খেলা থামিয়ে দ্রুত দৌড় দেয় বিভিন্ন বাড়ির দিকে, যেখানে সাইদের দলের বিচ্ছুরা রয়েছে। আর অতুল ভালো মানুষের মতো ফিরে যায় 'শামুক কুড়াতে'।

খবর পেয়েই সাইদরা বেরুতে শুরু করে। প্রস্তুতি আগেই ছিল, তাই বেরুতে দেরি হলো না। ওদের পাঁচজন ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়ে এসে ঢোকে নিবিড় ঘন পাটবনে, কোমর-সমান পানির মধ্যে। বাকি পাঁচজন লুকিয়ে থাকে বিলপাড়ের এক ঘন ঝোপের মধ্যে। ওদের দশজনের হাতেই এসএমজি, একটা করে হ্যান্ড গ্রেনেড আর কোমরে গোঁজা বড়ো ছুরি। ওরা দারুণ উত্তেজনায় নৌকাদুটোর জন্য অপেক্ষা করে আছে। একটা সেকেন্ডকে মনে হচ্ছে একঘণ্টা। পাটবনে পানির মধ্যে নানারকম মাছ দেখা যাচ্ছে। একটা ধোড়া সাপ খানিক দূর দিয়ে সাঁতরে চলে গেল একদিকে। মাথার ওপরে কয়েকটা চিল উড়ছে। ধোড়া সাপ কাউকে কামড়ায় না বলে সাপ দেখে কেউ ভয় পেল না। মাছের সাঁতার দেখা বা চিলের ডাক শোনার সময়ও ওদের নেই। ওদের সবগুলো চোখ তাক করা রয়েছে নৌকা দুটোর দিকে।

মিনিট দশেকের মধ্যে নৌকা দুটো একেবারে কাছাকাছি চলে এলো। তখনি শোনা গেল ভটভট শব্দ– তার মানে ইঞ্জিনওয়ালা নৌকা নিয়েই এসেছে রাজাকারেরা। অল্পক্ষণ পরেই নৌকা কূলে ভিড়ল। ওরা নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে ভালো করে এদিক-ওদিক

দেখল। খানিকক্ষণ কী যেন বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে। তারপর সবাই নেমে পড়ল নৌকা থেকে। তখনি দেখা গেল ওরা সংখ্যায় মোট বারোজন। একেক নৌকায় ছয়জন করে। ওদের চারজনের কাছে রাইফেল, বাকিদের হাতে লাঠি আর মোটা দড়ি। পরিকল্পনা মতো মুক্তিযোদ্ধারা সবাই চুপ করে থাকল পাটবনে আর বিলপাড়ের ঝোপের মধ্যে। রাজাকারেরা বিলের কিনারে দুটো খুঁটি গাড়ল পাশাপাশি, তারপর সেই খুঁটির সাথে নৌকা মজবুত করে বেধে। সারিবেঁধে গ্রামের দিকে হাঁটা জুড়ল। নৌকা পাহারা দেওয়ার জন্য কেউ থাকল না। হয়ত ভেবেছে এই দুর্গম পানিঘেরা গ্রামে কোনো শত্রু আসতেই পারে না। তাছাড়া গ্রামের নিরীহ মানুষের গরু-ছাগল লুটের মজা হয়ত কেউ হাতছাড়া করতে চায়নি বলে সবাই বেরিয়ে পড়েছে নৌকা অরক্ষিত রেখে।

সাইদরা এতটা আশা করেনি। প্রথম চেষ্টায় নৌকা দখল ও তা পানিতে ডুবিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের, কিন্তু তা যে এত সহজ হবে তা ভাবতে পারেনি। তারা ভেবেছিল, দুই নৌকার পাহারার কাজে অন্তত দুজন করে থাকবে; কিন্তু একী! মাথামোটা রাজাকাররা এত সাহস কোথায় পেল যে, কোনো পাহারা ছাড়াই নৌকা রেখে গেল? যাক, এতে বিচ্ছুদের জন্য মহাসুবিধে হলো। পাটবনের গ্রুপটি পানির ওপরে মাথাটি ভাসিয়ে দ্রুত চলে যায় নৌকার কাছে। তারপর বড়ো ধারালো ছুরি দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই নৌকার তলায় বেশ বড়োসড়ো ছিদ্র করে ফেলল। সাথে সাথে গল গল করে পানি ঢুকতে থাকে নৌকার মধ্যে। ছেলেরা তাড়াতাড়ি নৌকা ঠেলে বিলের গভীর পানির দিকে চালান করে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে নৌকার কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। নৌকা অপারেশন শেষ করে ছেলেরা ঝোপের বন্ধুদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পানি থেকে উঠল। পানি থেকে ওপরে উঠতেই দেখা গেল– সবারই হাঁটুর নিচে, উরুতে বড়ো বড়ো জোঁক কামড়ে ধরে আছে– এর আগে আরো কতটা যে রক্ত খেয়ে টইটম্বুর হয়ে ঝরে পড়েছে, তার কী ঠিক আছে? ওরা কাম্‌ড়ে-থাকা জোঁকগুলোকে তাড়াতাড়ি টেনে ফেলে দেয়, গল গল করে রক্ত ঝরে। এতক্ষণ ওরা কিছুই টের পায়নি রাজাকারের নৌকা অপারেশনের উত্তেজনায়। এখন পেল। জোঁকে রক্ত-খাওয়া জায়গাগুলো ভীষণ চুলকাচ্ছে। ওরা আগেই জানত পানির মধ্যে রক্তখেকো জোঁকেরা হামলা চালাবে, তাই প্রত্যেকের সাথেই ছোটো শিশিতে ভরা চুন ছিল। সেই চুন লাগিয়ে দিল চুলকানো জায়গাগুলোতে। চুলকানি কমতে থাকল বেশ দ্রুতই। ততক্ষণে ওরা ঝোপের মধ্যে বন্ধুদের সাথে মিশে যায়।

ওরা আলোচনায় বসে। আগেই ঠিক করা হয়েছিল– রাজাকারেরা গ্রামে লুট করতে গেলে প্রথমে নৌকা ডোবানো হবে, তারপর ওদের ওপর গ্রামেই হামলা চালানো হবে– এখন সেই পরিকল্পনায় আংশিক পরিবর্তন আনা হলো। এখন ঠিক করা হলো : না, গ্রামে আক্রমণ নয়; বরং তারা লুট করে ফিরে এলে এই বিলপাড়েই আচমকা হামলা চালিয়ে ওদের নিকেশ করা হবে। সেইমতো প্রস্তুত হয়ে বসে থাকে ওরা। এদিকে ঝোপের মধ্যেও কিন্তু আরাম নেই। এখানে রয়েছে বড়ো বড়ো রাক্ষুসে মশা। হুল ফুটিয়ে রক্ত খাচ্ছে। চড়চাপটে তাড়িয়ে দিয়েও রেহাই নেই। তার মধ্যেই তীক্ষ্ণ হুল ফুটিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে সুযোগ পেলেই। এভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর রাজাকারদের আসার আলামত পাওয়া গেল। তারা বেশ জোরে জোরে কথা বলছে, তাতে ভারি আনন্দ আর উত্তেজনার আভাস। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আরো কাছে চলে এলো। তখন দেখা গেল গ্রামের বেশকিছু সাধারণ মানুষকে। গরু-ছাগলের গলায় বাঁধা দড়ি তাদের হাতে, তারা টেনে আনছে। কারো কারো মাথায় বড়ো বড়ো বস্তা– মনে হয় তাতে চাল-ডাল ভরা। রাজাকারগুলো অস্ত্র আর লাঠি উঁচিয়ে তাদের খেদিয়ে আনছে। দেখলেই বোঝা যায়, এই লোকগুলো প্রাণ ভয়ে রাজাকারদের গরু-ছাগল আর ধান-চাল লুটের কাজে সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু বিলের কিনারে এসেই রাজাকারদের চোখ চড়কগাছে– একী! নৌকা কই? ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে গেল নাকি কেউ সরিয়ে ফেলল! ওরা ভয়ে লাফালাফি আর কাউমাউ জুড়ে দেয়। ভয়ের চোটে কয়েকজন রাইফেল উঁচিয়ে কয়েকটা ফাঁকা গুলি ছুড়ল আকাশের দিকে। তারপর তারা আচমকা রাইফেল তাক করে গ্রামের লোকগুলোর দিকে, যারা তখনো গরু-ছাগলের দড়ি ধরে আছে। লোকগুলো ভয়ে দড়ি ছেড়ে দেয়। সেই সুযোগে গরু-ছাগলগুলো

ছুটতে থাকে গ্রামের দিকে। কিন্তু সেদিকে রাজাকারদের খেয়াল নেই। তারা লোকগুলোকে লাইন করে দাঁড় করায়। তাদের ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এখনি গুলি করে মারা হবে হতভাগ্য এই মানুষগুলোকে। সাইদ সবাইকে বলে: এখনি হামলা চালাতে হবে। আর দেরি করলে এই নিরীহ মানুষগুলোকে গুলি করে মারবে রাজাকার জল্লাদরা। মুহূর্তে ওরা 'জয় বাংলা' বলে আকাশ ফাটিয়ে ঝোপঝাড় কাঁপিয়ে তোলে, তখনো বের হয়নি ঝোপ থেকে। শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন যে, 'জয় বাংলা'র আকাশ কাঁপানো শব্দ শুনেই রাজাকাররা ভয়ে অস্ত্র ফেলে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে। তখনি ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে মুক্তিযোদ্ধারা। তারা এতটা আশা করেনি– রাজাকাররা যে শুধু 'জয় বাংলা'তেই এমন ছ্যাড়াব্যাড়া হয়ে যাবে, যা ওদের কল্পনাতেই ছিল না; কিন্তু তাই হলো। ততক্ষণে গ্রামের মানুষগুলো 'জয় বাংলা'র উৎসের দিকেই দৌড় শুরু করেছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলিতভাবে ধাওয়া করে রাজাকারদের।

অস্ত্র ব্যবহার করতে হলো না, একটা গুলিও খরচ হলো না। গ্রামের ওই মানুষগুলো দ্রুত রাজাকারদের অস্ত্র আর লাঠিগুলো কুড়িয়ে নিলো। রাইফেলগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে ছুড়ে দিয়ে তারা লাঠিহাতে তাড়া করে রাজাকারদের। বেচারারা এত ভয় পেয়েছে যে, বিলের কিনারা থেকে বেশি দূর এগুতে পারেনি। নিজের চোখে এই প্রথম 'মুক্তি' দেখে কয়েকজন তো হুমড়ি খেয়ে পড়ে পানির মধ্যে; কয়েকজন গ্রামের দিকে দৌড়াতে থাকে। তাদের শায়েস্তা করার জন্য গ্রামের ওই লোকগুলোই যথেষ্ট ছিল। তারা লাঠি দিয়ে পিটিয়েই বেইমানদের মিরজাফরির প্রতিশোধ নিল। বলতে গেলে, একেবারে নীরবে, নিঃশব্দে দিয়াড়ার নৌ-অপারেশন সফল হলো সাইদদের।

এরপর পাটবন-ধানের জমির মধ্য দিয়ে পানিপথে এসে ওরা ওঠে শালবরাটের বিলপ্রান্তের বিশাল মেহগনি বাগানে। সেখানে এসে পোঁটলায় বাঁধা চিড়েমুড়ি দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারল। আতিকের কোমরে বাঁধা এক বোতল পানি ছিল, তাই দিয়ে কোনোরকমে তেষ্টা মেটাল। বেশ চনমনে লাগে তখন। তারপর মুহূর্তেই ওরা ঘুমিয়ে পড়ে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপরেই। কারণ, এই ভরদুপুরে প্রকাশ্যে বেরুনো যাবে না; বেরুতে হবে সেই সন্ধ্যায়– অন্ধকার যখন গাঢ় হবে, তখন।

সময়মতো মেহগনি বাগান থেকে বেরিয়ে ওরা ভোগের বিলপ্রান্তে আমাদের কাছে চলে এলো। সারাদিনের দুটি সফল অপারেশনে আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি নেই অর্থাৎ একশত ভাগ জয়। ওয়াকিটকিতে সব জানিয়ে দিলাম জমির ভাইকে। সব শুনে জমির ভাই যে আনন্দ আর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, তা তোমাদের বোঝানোর ভাষা আমার নেই, দাদুভায়েরা! ■ *(চলবে)*

শিশু সাহিত্যিক

ভাষ্য কেন স্যার হতে চায়

খায়রুল বাবুই

'রাজীব, পড়া শিখে আসোনি কেন? হুঁ? দেখি, বেঞ্চির ওপর ওঠো... । হ্যাঁ, এবার কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকো। পাক্কা ১১ মিনিট।'

'১১ মিনিট কেন স্যার?' রাজীব অবাক, '১০ মিনিট হলে হিসাব রাখতে সুবিধা হতো...!'

স্যার হাতঘড়ির দিকে তাকান, 'এই যে, হোমওয়ার্ক না-করে আসার পরও তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করবে– সেটা জানতাম। এ-জন্যই বাড়তি শাস্তি হিসেবে ১ মিনিট বেশি!'

রাজীব কান থেকে দুই হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, 'স্যার, আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে, আমি তর্ক করবই?'

'খামোশ! কান ধর্ বলছি...' স্যার ধমকে ওঠেন, 'আমি কীভাবে নিশ্চিত হলাম, তাই না? আরে, এই ক্লাসের সবকটাকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। তোমাদের কার কী অভ্যাস এবং কার কী কী বদভ্যাস– সব আমার ঠোঁটস্থ... । অ্যাই তানিয়া, তুমি বলো, ঠোঁটস্থ মানে কী?'

কান ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা রাজীবকে দেখে হাসিই থামাতে পারছে না তানিয়া। স্যারের কথায় নিজেকে সামলে নেয়, 'জি স্যার, আমাকে বলছেন?'

'তুমি ছাড়া এই ক্লাসে তানিয়া নামে আর কেউ আছে?'

তানিয়া উঠে দাঁড়ায়, 'না স্যার।'

'বলো, ঠোঁটস্থ মানে কী?'

'স্যার, এটা তো খুবই সহজ।' তানিয়া কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নেয়, 'যে বিষয়টা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানা থাকে, কেউ জানতে চাওয়ামাত্র বলা যায়, সেটাকেই বলে ঠোঁটস্থ।'

'একদম ঠিক বলেছ।'

উত্তর শুনে খুশি হলেন বারেক স্যার। বারেক রহমান, বিএসএস। ক্লাস থ্রির বাংলা পড়ান। রাজীবের দিকে তাকিয়ে ইশারা দেন তিনি। রাজীব বেঞ্চিতে বসে পড়ে। হঠাৎ স্যারের দৃষ্টি যায় চতুর্থ সারির বেঞ্চের দিকে। তিনি হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'ভাষ্য-ও-ও-ও-ও-ও...'

বিকট শব্দে নিজের নাম শুনে ঘুম ভেঙে যায় ভাষ্যর। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সে। দেখে, সামনে বাবা দাঁড়িয়ে।

'কী ব্যাপার ভাষ্য, স্কুল বন্ধ, তাই বলে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমাতে হবে?' বাবা গম্ভীর মুখে বলেন।

চোখ ডলতে ডলতে বিছানায় উঠে বসে ভাষ্য। দেয়ালে তাকায়। ঘড়িতে নয়টা একুশ। এই এক যন্ত্রণা। স্কুল যখন খোলা ছিল, ক্লাস শেষ হলেই আরাম! বাকিটা সময় নিজের মতো কাটানো যেত। আর এখন? হাতে অফুরন্ত টাইম। কিন্তু কোনোকিছুরই টাইম-টেবিল নেই।

হাই তুলতে তুলতে খাট থেকে নামে ভাষ্য। দাঁত ব্রাশ করে। নাশতা করে। তারপর যায় ছাদে। দেখে আরবি, ভাষা, বর্ণ– ওরাও আছে। ভাষা ওর বড়োবোন। বর্ণ আর আরবি জ্যাঠাতো ভাই-বোন। ওরা থাকে একই বাড়িতে।

ভাষ্যকে দেখে হই-হই করে উঠল সবাই।

'ওই দ্যাখ, এতক্ষণে স্যারের ঘুম থেকে ওঠার সময় হয়েছে।' বর্ণ আর ভাষার দিকে তাকিয়ে বলে আরবি।

'আপুনি, আমাকে খোঁচা মেরে কথা বলছ কেন?' ভাষ্য কপট রাগ দেখায়, 'দেখো, আমি বড়ো হয়ে কিন্তু স্যারই হবো। হুঁ...'

ভাষা চোখ বড়ো বড়ো করে, 'আমার ভাই কী বলল এটা? একসময় বলে ডাক্তার হবে। একসময় বলে পাইলট হবে। আজকে বলছে স্যার হবে। ঘটনা কী?'

'আর আমাকে একদিন বলেছিল সে সুপারম্যান হবে।' বলেই বর্ণ হাসতে থাকে।

'সব বাদ। আমি স্যারই হবো।' ভাষ্য একে একে তিনজনের মুখের দিকে তাকায়, 'আর, তোমরা সবাই আমাকে তখন ডাকবে 'ভাষ্য স্যার' বলে...।'

'কেন? আজ হঠাৎ স্যার হওয়ার ইচ্ছা হলো কেন তোর?' ভাষা জানতে চায়।

ভাষ্য মুচকি হাসে, 'কারণ স্যার হলে অনেক মজা। নিজে পড়া লাগে না, শুধু অন্যকে পড়া জিজ্ঞেস করলেই হয়। তা ছাড়া হোমওয়ার্ক না করলে অন্যকে ধমকও দেওয়া যায়।'

ভাষ্যর ব্যাখ্যা শুনে সবাই চুপ। যুক্তি তো একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো না!

'কিন্তু...,' বর্ণ মাথা চুলকাতে থাকে, 'স্যার হতে হলে তো অনেক কিছু জানতে হয়।'

'আমিও তো অনেক কিছু জানি।' ভাষ্য নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে।

আরবি অবাক, 'তাই নাকি? তুমি অনেক কিছু জানো?'

'হ্যাঁ।' গম্ভীর কণ্ঠে বলে ভাষ্য, 'বলো, তোমরা কে কী জানতে চাও? বলো বলো...'

এবার রীতিমতো বিপদে পড়ে আরবি, ভাষা আর বর্ণ। কী প্রশ্ন করা যায়– সেটাই ভাবতে থাকে। চট করে কোনো প্রশ্ন কি মাথায় আসে?

'আচ্ছা, বল্ তো, কলার খোসা কোথায় থাকে?' প্রশ্নটা করে ভাষা এমনভাবে ভাষ্যর দিকে তাকায়, ভাবটা এমন– পেয়েছি এবার, দেখি ক্যামনে তুই স্যার হোস!

ভাষার প্রশ্ন শুনে হাসতে হাসতে ভাষ্য বলে, 'এটা তো খুব সহজ প্রশ্ন। কলার খোসা থাকে... ইয়ে... কলার খোসা কোথায় থাকে যেন...?'

'হা হা হা...,' ভাষা শব্দ করে হেসে ওঠে, 'কী! পারলি না তো? শোন, কলার খোসা থাকে কলার গায়েই...।'

ভাষ্য বোঝানোর চেষ্টা করে, 'আরে, একটু ভাবতে তো দিবে নাকি? স্যাররা তো ভেবে-চিন্তেই উত্তর দেয়।'

'আচ্ছা, আমি তাহলে একটা প্রশ্ন করি।' বর্ণর কথা শুনে সবাই চোখ ফেরায় তার দিকে।

'হ্যাঁ, করো।' ভাষ্যর কণ্ঠ নির্বিকার।

'আমার প্রশ্নটা হলো,' একটু থেমে বর্ণ বলে, 'কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমায়?'

'হি হি হি। তোমরা কোনো কঠিন প্রশ্ন করতে পারো না? কী সব সহজ বিষয় জানতে চাও। দাঁড়িয়ে ঘুমায় তো আমাদের স্কুলের দারোয়ান চাচ্চু!' ভাষ্য তাকায় আরবির দিকে, 'কী আপুনি, ঠিক বলেছি না?'

'হা হা হা...' ভাষ্যর উত্তর শুনে সবাই একসঙ্গে ছাদ-কাঁপিয়ে হেসে ওঠে।

আরবি হাসি থামিয়ে বলে, 'আরে বোকা, দাঁড়িয়ে তো ঘুমায় ঘোড়া।'

'তাই তো, তাই তো।' ভাষ্য চিৎকার করে ওঠে, 'এটা তো জানতাম। গতকালই আম্মুর কাছে শুনেছিলাম।'

'তুই তো কোনো প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারছিস না।' ভাষা টিটকারি করে, 'স্যার হতে হলে তোকে আরও অনেক অনেক পড়াশোনা...'

'শোনো ছোটো-আপি,' ভাষ্য হাত তুলে ভাষাকে থামায়, 'তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল করেছি। আসলে স্যারদের উত্তর দিতে হয় অনেক চিন্তা-ভাবনা করে...'

'কীসের এত চিন্তা-ভাবনা তোমাদের, শুনি।' কখন যে পেছনে রেশমা ম্যাডাম এসে দাঁড়িয়েছেন– খেয়াল করেনি কেউ। রেশমা ম্যাডামকে দেখে চারজনেরই বুকটা ধক্‌ করে ওঠে। ছাদ থেকে এক দৌড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছাটাকে খুব কষ্টে দমন করল ওরা।

রেশমা ম্যাডাম থাকেন দোতলায়। একটা স্কুলে বিজ্ঞান পড়ান। যদিও ওদের কেউ-ই রেশমা ম্যাডামের স্কুলে পড়ে না, তারপরও সবাই তাকে ম্যাডামই ডাকে। বাসার নীচে, সিঁড়িতে বা ছাদে– যেখানেই দেখা হোক, রেশমা ম্যাডাম নানা প্রশ্ন করেন। তাই ম্যাডামকে দেখলেই ওরা পালিয়ে বেড়ায়।

'ম্যাডাম জানেন,' ভাষা একটু কাছে এগিয়ে আসে, 'আমার ভাই, মানে ভাষ্য আপনার মতো ম্যাডাম, না মানে ইয়ে..., স্যার হতে চায়। হা হা হা...।'

রেশমা ম্যাডাম অবাক হন, 'আরে, এতে হাসির কী আছে? ভাষ্য স্যার হবে– এ তো খুবই ভালো কথা। ভাষ্য, স্যার বানান করো তো।'

'এস আই আর...।' ভাষ্য সঙ্গে সঙ্গে বলে।

'গুড।' ম্যাডাম পিঠ চাপড়ে দেন ভাষ্যর।

'কিন্তু ম্যাডাম,' ভাষ্যর কিছুটা মন খারাপ, 'আমি তো জানতাম স্যার হলে পড়তে হয় না। শুধু পড়াতে হয়।'

রেশমা ম্যাডাম হাত রাখেন ভাষ্যর মাথায়, 'শোনো বাবা, অন্যকে পড়াতে হলে নিজেকে অনেক বেশি বেশি পড়তে হবে। জানতে হবে। নানা বিষয়ে খোঁজখবর রাখতে হবে। বুঝেছ?'

ভাষ্য মাথা নাড়ায়, 'হুঁ।'

ম্যাডাম হাঁটু গেড়ে বসে ভাষ্যর চশমাটা ঠিক করে দেন, 'কী বুঝেছ, বলো তো একবার?'

'স্যার হতে হলে অনেক কিছু পড়তে হয়। অনেক কিছু জানতে হয়।' ভাষ্য মিনমিন করে বলে।

উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে রেশমা ম্যাডাম বলেন, 'তাহলে ভাষ্য এখন থেকে কী করবে?'

আরবি, ভাষা আর বর্ণ একসঙ্গে বলে ওঠে, 'ভাষ্য এখন থেকে অনেক অনেক বই পড়বে। অনেক কিছু জানবে। কারণ সে বড়ো হয়ে স্যার হতে চায়।'

'ভেরি গুড।' ম্যাডাম উঠে দাঁড়ান, 'আচ্ছা, তোমরা কে বলতে পারবে মশার দাঁত কয়টি? ৪৭ না ৪৮?'

আচমকা ম্যাডামের প্রশ্ন শুনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে ওরা। চারজন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এ কোন বিপদের মধ্যে পড়ল আবার!

ভাষ্য সাহস করে বলে, 'ম্যাডাম, মশারা এত ছোটো ছোটো যে, ওদেরই তো ভালোভাবে গোনা যায় না। মশার দাঁত গুণব কীভাবে?'

তখনই মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। রেশমা ম্যাডাম চারজনের দিকে তাকান, 'কোন প্রাণীর দাঁত কয়টা– এ বিষয়ে পরে কোনোদিন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব।' বলে তিনি ফোন রিসিভ করেন। তারপর কথা বলতে বলতে ছাদ থেকে নেমে যান।

সবাই রীতিমতো যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। আরবি, বর্ণ আর ভাষা একসঙ্গে তাকায় ভাষ্যর দিকে। তিনজনের মনের কথাটাই বলে বর্ণ, 'ভাষ্য, তুমি না স্যার হবে? তাহলে যাও, কোন প্রাণীর কয়টা দাঁত মুখস্থ করতে থাকো।'

ভাষ্য কোনো উত্তর না দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোতে থাকে। মনে মনে বলে, 'বাপরে! স্যার হওয়াটা তো দেখছি সহজ বিষয় না। স্যার হতে হলে কত কিছু যে জানতে হয়। ওফ্!' ■

শিশু সাহিত্যিক ও প্রযোজক, চ্যানেল বাংলাভিশন

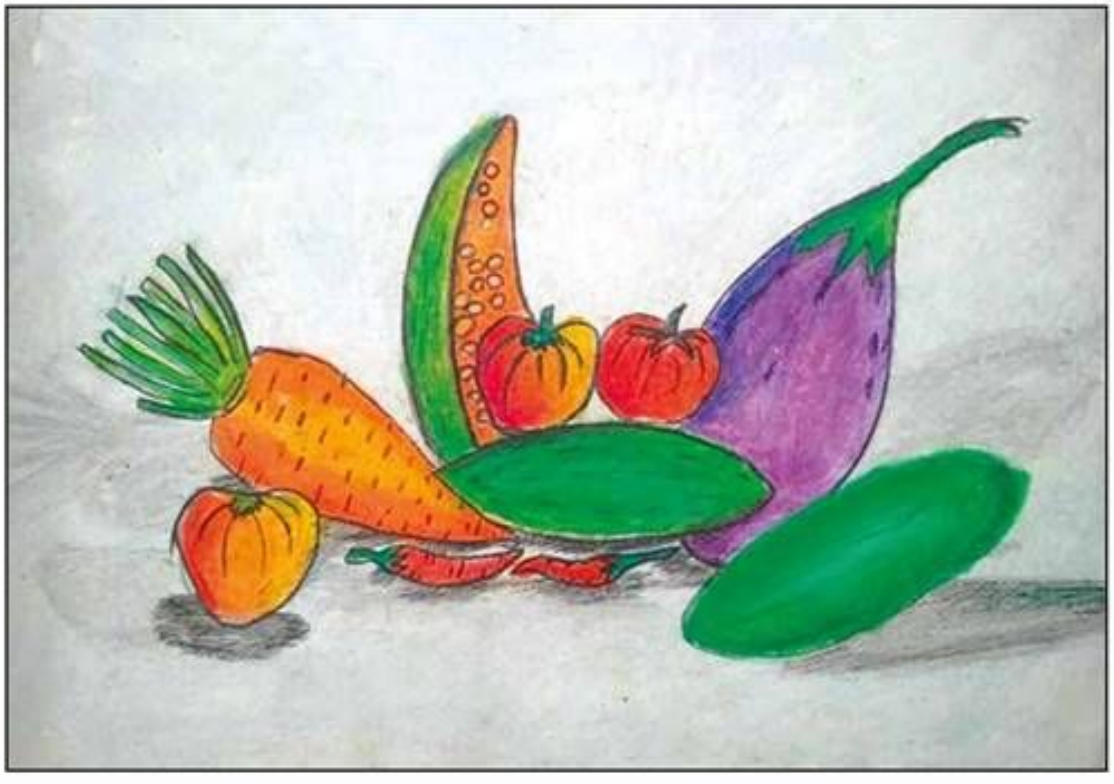

রুকাইয়া রুকু, সপ্তম শ্রেণি, সরুপচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়, মুন্সিগঞ্জ

খুকি ও কাঠবিড়ালির সখ্য

পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

কাঠবিড়ালি! কাঠবিড়ালি!
পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি নেবু? লাউ?
বেরাল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা? তাও?

ডাইনি তুমি হোঁৎকা পেটুক,
খাও একা পাও যেথায় যেটুক!
বাতাবি-নেবু সকলগুলো
একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো!
তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস্ পাটুস্ চাও?
ছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) শিশু অন্তপ্রাণ ছিলেন। তিনি সবসময় চিত্তে লালন করতেন যে কোমলমতি শিশুদের মনের ভাষা বুঝতে হবে। 'খুকি ও কাঠবিড়ালি' কবিতাটি সৃষ্টির পেছনে একটি কাহিনি রয়েছে। এই কবিতাটি ১৯২১-১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নজরুল কুমিল্লায় রচনা করেন।

কুমিল্লা শহরে এক সময় ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ি ছিল। তিনি ছিলেন নজরুলের সহধর্মিণী প্রমীলার কাকা। প্রমীলার কাকাত বোন অঞ্জলি সেনগুপ্ত (জটু)। নজরুল রচিত 'খুকি ও কাঠবিড়ালি' কবিতার 'খুকি' হলো জটু। ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের সেই বাড়িতে একটি পুকুর ছিল। বাড়ি ও পুকুর এই দুয়ের মাঝে একটি বাগান এবং সেই বাগানের মধ্যে একটি পেয়ারা গাছ ছিল। খুকি খুব পেয়ারা পছন্দ করত। সে একদিন দেখে যে বাড়ির পেয়ারা গাছটিতে কাঠবিড়ালি পাকা পেয়ারা খাচ্ছে। সেটা দেখে খুকির একটি পেয়ারা খাওয়ার ইচ্ছে জন্মে। খুকি পেয়ারা পাওয়ার ইচ্ছায় কাঠবিড়ালির সাথে কথোপকথন শুরু করে দেয়। এক ডাল থেকে আরেক ডালে কাঠবিড়ালির দ্রুত বেগে যাতায়াত দেখে খুকি খুব আশান্বিত হয় যে তার কাছে একটি পেয়ারা চাইলে পাওয়া যাবে। খুকি কাঠবিড়ালির কাছে একটি পেয়ারা পাওয়ার আশায় বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু খুকি কাঠবিড়ালির কাছে লেনাদেনার আপ্রাণ চেষ্টা করেও কাঠবিড়ালির কাছ থেকে পেয়ারা পেতে সফল হয়নি।

আর বাড়ির ভেতর থেকে জানালা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখে কবি নজরুল 'খুকু ও কাঠবিড়ালি' এর মতো এক সুন্দর শিশু কবিতা লিখে ফেললেন।

'খুকি ও কাঠবিড়ালি' কবিতাটির রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মুজফ্ফর আহমদের 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা' গ্রন্থ থেকে জানা যায়– এর রচনার পেছনে যে ঘটনা ঘটেছিল নজরুল তা আমাদের বলেছিল। সে একদিন দেখতে পেল যে শ্রী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের শিশু কন্যা জটু (ভালো নাম শ্রীমতী অঞ্জলি সেন) একা একা কাঠবিড়ালির সাথে কথা বলছে। তা

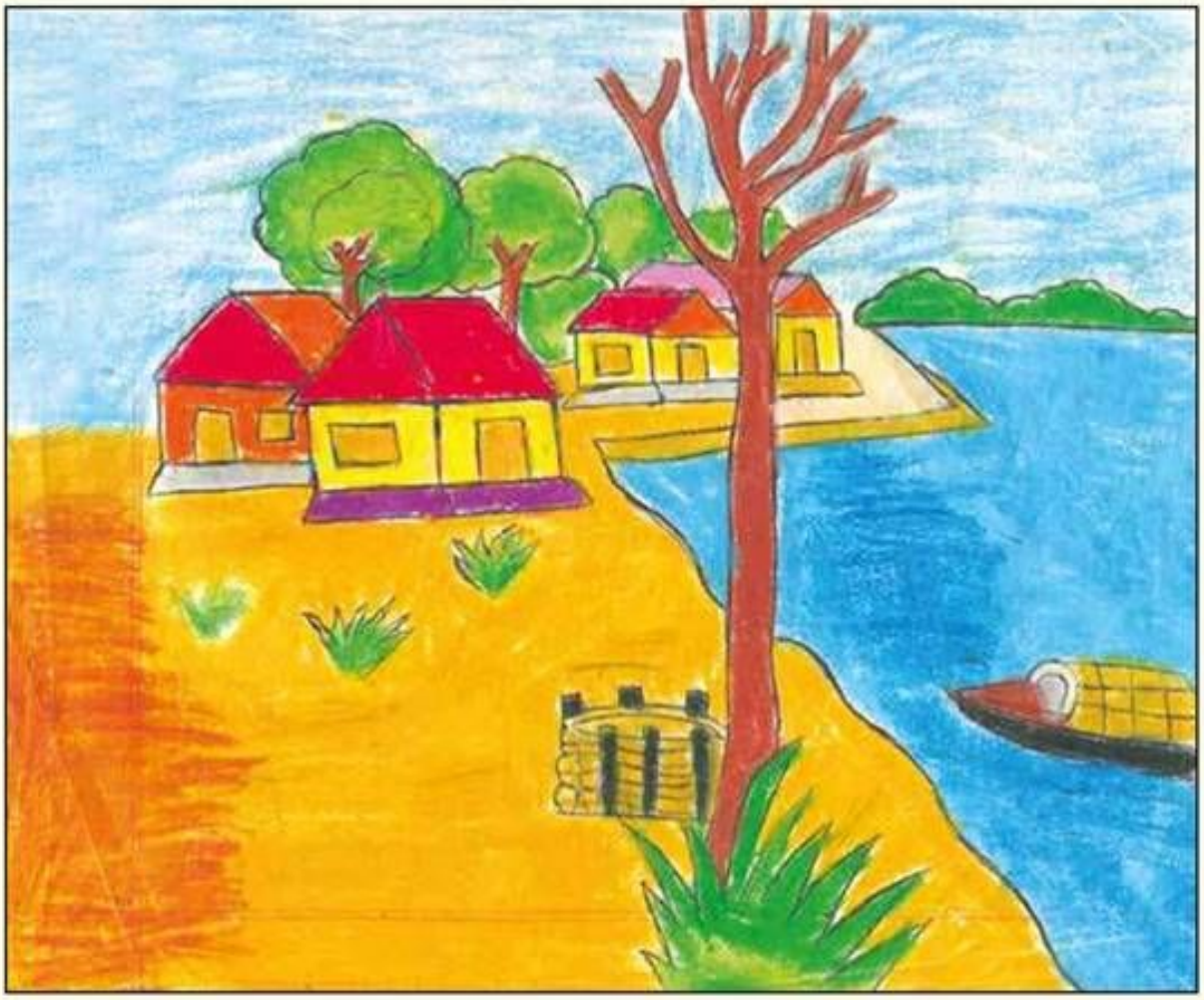

সাকিব রহমান, পঞ্চম শ্রেণি, খিলগাঁও মডেল হাই স্কুল, ঢাকা।

দেখেই নজরুল কবিতাটি লিখে ফেলে। এই কবিতায় 'রাঙা দা' হচ্ছেন শ্রী বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, বৌদি তাঁর স্ত্রী, আর ছোড়দি বীরেন সেনের বোন কমলা দাশগুপ্তা। 'রাঙা দিদি' মানে প্রমীলা, নজরুল ইসলামের স্ত্রী।

'খুকি ও কাঠবিড়ালি' কবিতাটি 'ঝিঙে ফুল' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। নজরুল কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন 'বীর বাদলকে'। ঝিঙে ফুল কাব্যগ্রন্থের আরো কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করা হলো : 'প্রথম প্রকাশ : ১৩৩৩ সালের আশ্বিন (১৯২৬ খিষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল) গ্রন্থাকারে বাজারে বের হয় বলিয়া সাপ্তাহিক 'গণবাণী' পত্রিকার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে অনুমিত হয়। প্রকাশক : গোপালদাস মজুমদার, ডি. এম লাইব্রেরি, ৬১ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১+৪২। মূল্য : বারো আনা।'

কাজী নজরুল ইসলামের চিত্তভূমি ছিল শিশুসুলভ। শিশু-কিশোরদের মনোজগৎ নজরুলের কবিতায় রেখাপাত করে। তাইতো নজরুলের 'খুকি ও কাঠবিড়ালি'র মতো কবিতাটি রচনা করা সম্ভব হয়েছে।

[বি.দ্র.- আমি (লেখক) ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের ১২ তারিখে এই কবিতাটি সৃষ্টির প্রেক্ষাপট সরাসরি শুনেছি ভারত নিবাসী অঞ্জলি সেনগুপ্তা (জটু)-এর পুত্র অশোক কুমার সেনগুপ্তের কাছ থেকে।] ■

নজরুল গবেষক

রাজধানী ঢাকার প্রথম পাঠাগার

ইফতেখার আলম

রাজধানী ঢাকার প্রথম পাঠাগার কোনটি? এর উত্তরে বেশিরভাগ মানুষই বলবেন, নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি। কিন্তু, এটি প্রতিষ্ঠার ১৩ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় রামমোহন রায় লাইব্রেরি। তবে কালের বিবর্তনে এটি এখন হারিয়ে যেতে বসছে। ধুলোর আস্তরণ জমেছে লাইব্রেরির বইয়ের পাতায়। জরাজীর্ণ বইগুলোর বাঁধাইও ছুটে যাচ্ছে। মূল ভবনটিও এখন পরিত্যক্ত। করোনার কারণে এখন আর খোলে না লাইব্রেরির দরজা। শুধুমাত্র পাঠক এলেই খুলে দেওয়া হয়।

রাজধানীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পেরিয়ে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। এটি পেরিয়ে যেতেই বাংলাদেশ ব্রাহ্ম সমাজ। এখানেই রয়েছে রামমোহন রায় লাইব্রেরি। ব্রাহ্ম সমাজের গেট দিয়ে ঢুকতেই একটি জরাজীর্ণ ভবনের সামনে লেখা আছে 'রাজা রাম মোহন রায় পাঠাগার'। ১৮৬৯ সালে ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ই ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অভয় চন্দ্র দাশ মন্দির ভবনে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭১ সালের ১৮ই জানুয়ারি দ্বিতল ভবন তৈরি করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন পাঠাগারটি। এখন আর সেখানে নেই। ভবনটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার সেখান থেকে সরিয়ে মন্দির ভবনে নেওয়া হয়েছে।

১৯২৬ সালে এখানে এসেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীর্ঘ সময় এ পাঠাগারে সময় কাটিয়েছিলেন জ্ঞানতাপস ও বহু ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। বিখ্যাতজনদের মধ্যে আরো এসেছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, কবি শামসুর রাহমান। রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের মা কবি কুসুমকুমারী দেবীও এই পাঠাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাঠাগারটি। এখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেছিল। লুট হয়ে যায় শত বছরের পুরনো মূল্যবান নথিপত্র, সাময়িকী ও বই। এর আগে পাঠাগারের সংগ্রহে ছিল প্রায় ৩০ হাজার বই। কিছু বই ছিল একেবারেই দুর্লভ। সে সময় প্রতিদিন গড়ে ১০০ থেকে ১৫০ পাঠক এই পাঠাগারে আসতেন।

স্বাধীনতার পর আবার পাঠাগারটি চালু করা হয়। বর্তমানে ব্রাহ্ম মন্দির ভবনের দোতলার একটি অংশে

চালু রয়েছে পাঠাগারটি। কাঠের পাটাতন আর অপ্রশস্ত খাড়া সিঁড়ি পেরিয়ে ঢুকতে হয় সেখানে। সেখানে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। আরো আছে কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জসীমউদদীন ও সুফিয়া কামালের মতো বরেণ্য সাহিত্যিকদের আলোকচিত্র। নজর কাড়বে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা বিশ্বের বড়ো বড়ো সব লাইব্রেরির আলোকচিত্রও। বর্তমানে পাঠাগারটিতে ৫০০ থেকে ৬০০ বই আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিশ্ববাণী প্রকাশিত মহাভারতের ২১ পর্ব, বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী, ব্রাহ্ম ধর্মভিত্তিক প্রায় সব বই, রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী, আছে সব পবিত্র ধর্মগ্রন্থও।

বাংলাদেশ ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সম্পাদক রণবীর পাল রবি জানান, ২০০৪ সাল থেকে এ ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় পাঠাগারটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ১০ বছর বন্ধ থাকার পর ২০১৪ সালে মন্দির ভবনে আবারও চালু হয় পাঠাগারটি। তিনি আরো জানান, 'করোনার কারণে এখানে পাঠকের সংখ্যা অনেক কমে যায়। বর্তমানে পাঠক আসলে আমরা লাইব্রেরির দরজা খুলে দিই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষকরাই মূলত এখানে আসেন। এখনও যে কেউ চাইলে পাঠাগারটিতে প্রবেশ করতে পারেন, বই পড়তে পারেন।

ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৮৭১ সালে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা, ধর্মালোচনা, ও সমাজ সংস্কার মূলক কাজের পাশাপাশি একটি পাঠাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ঢাকার নাট্য আন্দোলনের অন্যতম সূচনাকারী অভয় চন্দ্র দাস। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন-এর নামানুসারে পাঠাগারটি 'রামমোহন গণ-পাঠাগার' নামকরণ করা হয়।■

প্রাবন্ধিক

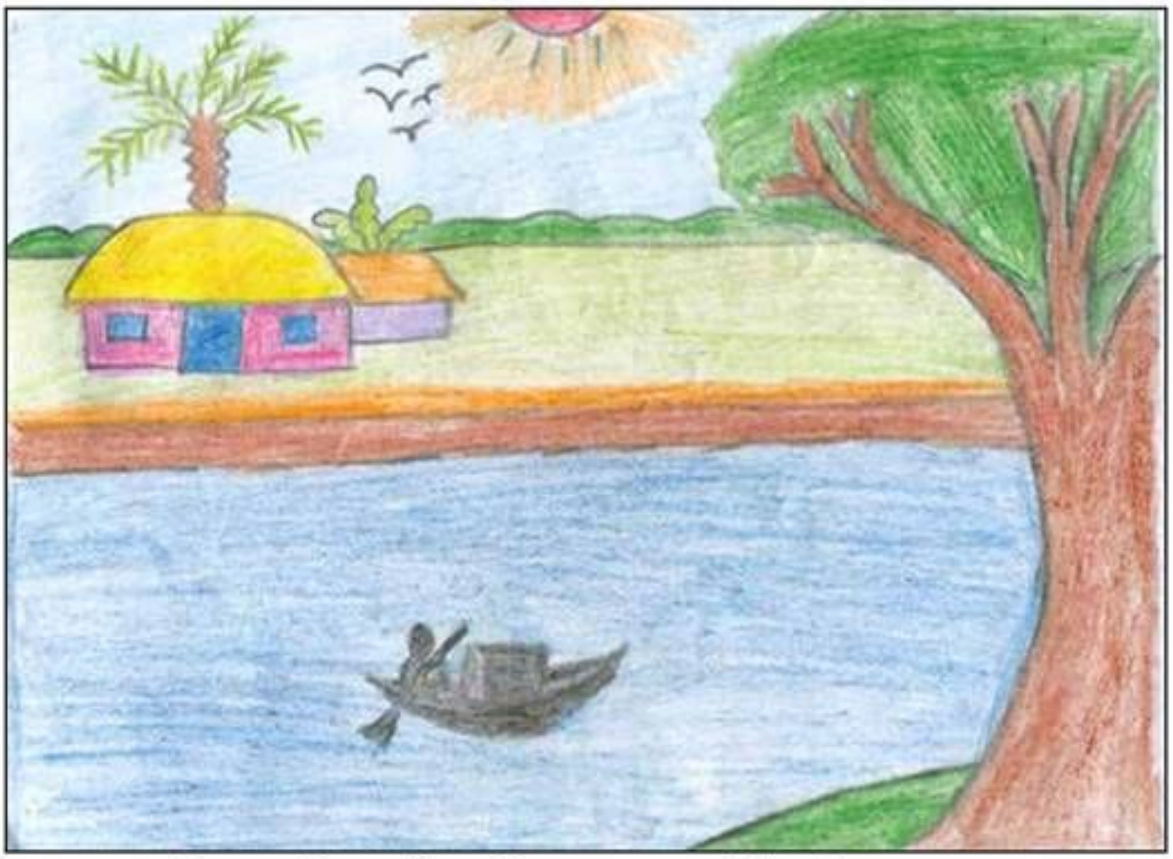

সারিকা তাসনিম, তৃতীয় শ্রেণি, গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

ভাষা
মঈনুল হক চৌধুরী

মায়ের ভাষার চাইতে মধুর
কোন ভাষাটা আছে?
আমার ভাষা বাংলা ভাষা
প্রিয় আমার কাছে।
হৃদয়জুড়ে এই ভাষাতে
হরেক স্বপ্ন আঁকি,
এক একটি বর্ণমালা
ঠিক যেন সুর পাখি।
ভাষার জন্য নিজের বুকের
রক্ত দিলেন যাঁরা,
ইতিহাসে ভাষা শহিদ
খেতাব পেলেন তাঁরা।
ভাষা শহিদ ভাইরা আমার
অমর হয়ে রবে,
তাই তো তাদের শ্রদ্ধাভরে
স্মরণ করি সবে।

বাংলা আমার
মো. জাহাঙ্গীর আলম

বাংলা আমার মাতৃভাষা
ভালো থাকার স্বপ্ন আশা।
বুকের তাজা রক্তে লেখা
শহিদ স্মৃতি প্রাণের রেখা।
হৃদয় মাঝে শপথ আঁকা
সত্য ন্যায়ের পক্ষে থাকা।
সামনে চলার দৃপ্ত রবি
বর্ণমালায় রূপের ছবি।
বাংলা আমার গানে গানে
মাঠ ভরা ওই সোনা ধানে।
সরল সোজা পথে চলা
বাংলা ভাষায় কথা বলা।
কামার কুমার তাঁতি জেলে
বাংলা ভাষার সুবাস ঢেলে।
বেঁচে থাকা মিলেমিশে
খুঁজে ফেরা আলোর দিশে।

কাদের দানের বাংলা ভাষা
শাজাহান কবীর

বাংলা ভাষা কাদের ভাষা
এই যে তোমার-আমার
বায়ান্নতে শহিদ হলেন
রক্ত যাঁদের জামার।
তাঁদের জীবন ঢেলে দিলেন
বাংলা ভাষার জন্য
আমরা পেলাম স্বাধীন ভাষা
তাতেই হলাম ধন্য।
তাঁদের দানের বাংলা ভাষা
সবাই বলি মুখে
বাংলা ভাষায় বললে কথা
তাঁরাই থাকে বুকে।
রফিক, সালাম আরো কত
বাংলা ভাষার বীর
পাহাড় সমান করেছিল
বাংলাদেশের শির।

ছেলে আছে মায়ের মনে
জসীম মেহবুব

ফেব্রুয়ারি এলে মায়ের
বাধ মানে না চোখের পানি,
বাবা তাকায় উদাস চোখে
মন করে হায় কেমন জানি !
সারাদেশে প্রভাতফেরি
শহিদমিনার ফুলে সাজে,
ছেলের জন্য বাবা-মায়ের
ব্যথা বাড়ে বুকের মাঝে।
সেই যে কবে মায়ের হাতে
খেয়েছিল পিঠে-পুলি,
এসব চোখে ভেসে ওঠে
ভেসে ওঠে স্মৃতিগুলি।
সেই স্মৃতিরা আসে ঘুরে
ফেরে না সেই মায়ের ছেলে,
মা বসে রয় ঘরের দাওয়ায়
মন হয়ে যায় এলেবেলে।

যে ভাষাতে দোয়েল ডাকে

খোরশেদ আলম নয়ন

যে ভাষাতে দোয়েল ডাকে
শাপলা ছড়ায় হাসি
রাখাল ছেলে মনের সুখে
বাজায় বাঁশের বাঁশি

কাঁঠাল বনে ঝিঁঝিঁ ডাকে
যে ভাষারই সুরে
শিশুর স্বপন মন আকাশে
যে ভাষাতে উড়ে

যে ভাষাতে হারান মাঝি
বৈঠা চেপে ধরে
অস্ত্র হাতে সোনর ছেলে
স্বাধীন স্বদেশ গড়ে

সে ভাষা'ই যায় ফুটিয়ে
বাংলা নামের ফুল
ভুবন জুড়ে হয় না কোথাও
এই ভাষারই তুল।

বাংলা

রুহুল আমিন সজল

জ্ঞানী গুণী গাঁয়ের চাষা
বাসেন ভালো বাংলা ভাষা
বাংলা সবার স্বপ্ন-আশা
এই ভাষাকেই আমরা নিয়ে
করছি অহংকার;
বাংলা আমার মায়ের মুখের
শ্রেষ্ঠ অলংকার।

এই ভাষাতেই বলছি কথা
আর খুঁজে পাই জয়বারতা
গাই শত গান যথাতথা
বাংলা আমার বুক ভরা সুখ
শক্তি-সাহস দেয়;
মায়ের কাছে মাটির কাছে
সেই তো টেনে নেয়।

বাংলা প্রিয় মায়ের ভাষা
ভাষার মাঝে সবচেয়ে খাসা
তার মাঝে ভাই নাই নিরাশা
আছে শুধু সম্ভাবনার আলো
মন থেকে এই বাংলাকে তাই
আমরা বাসি ভালো;
দূর করে ভয়-কালো।

মায়ের ভাষা

শাহরুবা চৌধুরী

বাংলা আমার মায়ের ভাষা বাংলা তুমি প্রাণ
মনের যত আনন্দ আবেগে জাগে গান।
কায়দে আযম ঢাকায় এসে উর্দুতে কথা বলে
রাষ্ট্রভাষা উর্দু ঘোষণায় বাঙালিরা উঠল জ্বলে।
চালালো গুলি পাকি পুলিশ মেডিকেল কলেজ গেটে
লুটিয়ে পড়ল বাংলার সন্তান গুলির ভীষণ চোটে।
রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, মনু মিয়া
আরো কত অজানা নাম আহূতি দিয়া।
রক্তে ভাসল ঢাকার রাজপথ শোকার্ত হলো দেশ
পাকিদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা বলে হবে না শেষ!
বাংলা আমার মায়ের ভাষা বাংলা জন্মভূমি
মা আমার জন্মদাত্রী আমি তাঁরই পদ চুমি।

চর্যাপদের সুর

মিজানুর রহমান মিথুন

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
জীবন দিলেন যারা,
ইতিহাসের সোনার রথে
চড়ে ছিলেন তারা।

সোনার রথের যাত্রীরা সব,
আঁধার করে দূর,
বাজিয়ে গেলেন বাংলা ভাষার
চর্যাপদের সুর।

অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশির
রাগের মাতম তুলে
জীবন দিলো সেদিন সবে
বুকের কপাট খুলে।

একুশ মানে

আ. শ. ম. বাবর আলী

একুশ মানে বাংলা ভাষার
গর্ব ইতিহাস,
আপন ভাষায় সবার সাথে
সুখের বসবাস।

রফিক সালাম বরকতেরা
জীবন দিল সবে,
বিনিময়ে বাংলা ভাষা
ভরাল গৌরবে।

এসো আমরা সবাই মিলে
সেই ইতিহাস পড়ি,
বাংলা লিখে বাংলা পড়ে
জীবনটাকে গড়ি।

অমর ফেব্রুয়ারি

সাবিত্রী রানী

ভাষার মাস অমর ফেব্রুয়ারি
মায়ের কান্না ঝরে।
তবুও আজ মোরা গর্ব করি
ভাষা শহিদের স্মরে।
শ্রদ্ধা জানাই নম্র শিরে
তোদের মোরা ভাই।
বাংলা ভাষা মর্যাদা পেল
বিশ্বের বুকে ঠাঁই।
জননীর ব্যথা সার্থক হলো
সন্তানের অমূল্য দানে।
আপন করে পেলাম মোরা
বাংলা মনে প্রাণে।

ভাষা আমার

শচীন্দ্র নাথ গাইন

ভাষা আমার
প্রাণের মাঝে হাজার গোলাপ ফুল,
জল থই থই ঢেউয়ের নদীর ছাপানো দুই কূল।

ভাষা আমার
রাখাল রাজার মিঠে বাঁশির সুর,
বুকের মাঝে জড়িয়ে রাখা স্বপ্ন সমুদ্দুর।

ভাষা আমার
দোল জাগানো একতারাটার তান,
দাঁড় ছপছপ নায়ের মাঝির দরদমাখা গান।

ভাষা আমার
স্নিগ্ধ রাতের আকাশ ভরা নীল,
শাপলা ফোটা শান্ত দিঘি,কলমিলতার বিল।

ভাষা আমার
চোখ জুড়ানো সবুজঘেরা বন,
সাগর সেঁচে পাওয়া এ যে পরম প্রিয় ধন।

ভাষা আমার
বাবার আদর মায়ের স্নেহের সুখ,
মনের পাতায় পষ্ট লেখা শহিদ ভাইয়ের মুখ।

ভালো চাচা ও তিন পচার গপ্‌পো

নাসরীন মুস্তাফা

এক দেশে ছিল এক লোক। লোকটা ছিল ভালো। খুব ভালো। সব সময় বলত, চাইলেই ভালো কাজ করা যায়।

ভালো লোকটি সব সময় ভালো ভালো কাজ করত। আর তাই সবাই তার নাম দিয়েছিল- ভালো চাচা।

ভালো চাচাকে ভালোবাসত সবাই। কেবল ভালোবাসত না তিনজন লোক। কারা তারা?

দুই.

ভালো চাচাকে ভালোবাসে না তিনজন। ভালো কাজ করাকেই ভালোবাসে না ওরা। তাই ভালো চাচাকেও ভালোবাসে না।

ওরা তাহলে করে কী?

ওরা কেবলই পচা পচা কাজ করত। আর তাই সবাই ওদেরকে কি নামে ডাকত, জানো?

বড়ো পচা, মেঝ পচা আর ছোটো পচা।

ওদের মন খারাপ। কেন? কেন?

তিন.

তিন পচার মন খুব খারাপ। ওরা কোনো পচা কাজ করতে পারছে না। ভালো চাচা করতে দেয় না।

কী করা যায়?

ওরা ভাবে।

ভাবতে ভাবতে খোঁজ পায়...

চার.

সেই দেশে ছিল এক জাদুকর। তার কাছে ছিল তিনটি জাদুর চকলেট।

বড়ো পচা জাদুকরের কাছ থেকে একটি চকলেট নিয়ে এল।

বড়ো পচা এই চকলেট দিয়ে কী করবে?

পাঁচ.

বড়ো পচা ভালো চাচার কাছে গেল। বলল, তোমার জন্য চকলেট এনেছি। খেয়ে দেখ, কত্ত মজা!

ভালো চাচা ভাবল, চাইলেই ভালো কাজ করা যায়। এই চকলেট খেলে বড়ো পচা খুশি হবে।

এটাও তো ভালো কাজ।

ভালো চাচা কী খেল সেই চকলেট?

কী মনে হয় তোমার?

ছয়.
ভালো চাচা চকলেট খেল।

আর অমনি ভালো চাচা হয়ে গেল ইয়া মোটা এক লোক। সবাই তাকে ডাকতে লাগল, মোটু চাচা!

মোটু চাচা কি আর ভালো কাজ করতে পারবে?

তোমার কি মনে হয়, বলো তো?

সাত.
বড়ো পচা খুশি মনে গেল পচা কাজ করতে।

কী সেই পচা কাজ, জানো?

শহরের সবচেয়ে বড়ো অফিসটাতে ডাকাতি করল বড়ো পচা। টাকার বিরাট ঝোলা লুট করে বেরিয়ে এল। এখন কে আর ওকে আটকাতে পারবে?

মোটু চাচা পারবে?

কী মনে হয়, বলো তো?

আট.
বড়ো পচাকে আটকাতে এল মোটু চাচা!

বিশাল ভুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে বড়ো পচা পড়ে গেল মাটিতে। আর উঠতেই পারল না! পুলিশ এসে সহজেই ধরে নিয়ে গেল ওকে।

মোটু চাচা বলল, মোটু হলেও ভালো কাজ করা যায়।

নয়.
আসলে, চাইলেই ভালো কাজ করা যায়।

দশ.
মেঝ পচা ভাবল, আরো বড়ো চালাকি করতে হবে। জাদুকরের কাছ থেকে পরের চকলেটটি চেয়ে আনল। মোটু চাচার কাছে গিয়ে চকলেট দিলো। বলল, খেয়ে দেখ। খু-উ-ব মজা!

ভালো চাচা ভাবল, এই চকলেট খেলে মেঝ পচা খুশি তো হবে।

মোটু চাচা চকলেট খেতেই হয়ে গেল ইয়া লম্বু এক লোক। সবাই তাকে ডাকতে লাগল, লম্বু চাচা!

এগারো.
মেঝ পচা খুশি মনে গেল পচা কাজ করতে। শহরের সবচেয়ে উঁচু বাড়িটাতে ডাকাতি করল। বাড়ির সবাইকে বেঁধে লুটপাট করতে লাগল। ভাবছিল, কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

সত্যি নাকি? কেউ ওকে আটকাতে পারবে না?

লম্বু চাচাও না?

তুমিও কি তা-ই ভাবছ?

লম্বু চাচা কীভাবে আটকাবে বলে মনে হয়?

বারো.
লম্বু চাচা ঠিকই উঁচু বাড়ির জানালা দিয়ে দেখল। লম্বু হাত বাড়িয়ে দিল ঘরের ভেতর। মেঝ পচার মুখে লাগিয়ে দিল বিশাল এক চড়।

চড় খেয়ে পড়ে গেল মেঝ পচা। আর উঠতেই পারল না!

পুলিশ এসে সহজেই ধরে নিয়ে গেল ওকে।

লম্বু চাচা বলল, মোটু হলেও ভালো কাজ করা যায়।

তেরো.
আসলে, চাইলেই ভালো কাজ করা যায়।

চৌদ্দ.
ছোটো পচা আরো পচা কিছু করতে চাইল।

আর তাই, জাদুকরের কাছ থেকে চেয়ে আনল শেষ চকলেটটি।

লম্বু চাচার কাছে গিয়ে চকলেট দিল। বলল, খেয়ে দেখ। খু-উ-ব মজা!

লম্বু চাচা ভাবল, চাইলেই ভালো কাজ করা যায়।

এই চকলেট খেলে ছোটো পচা খুশি তো হবে।

পনেরো.
যেমন ভাবা, তেমন কাজ। চকলেট খেয়েই লম্বু চাচা কি হয়ে গেল, জানো ?

এখন সে খুব বেশি মোটা না। এখন সে খুব বেশি লম্বু না।

সবাই তাকে ডাকতে লাগল, মাঝামাঝি চাচা !

সবাই ভাবছিল, মাঝামাঝি চাচা কি ভালো কাজ করতে পারবে?

তুমি কি ভাবছ? পারবে?

ষোলো.
ছোটো পচা খুশি মনে গেল পচা কাজ করতে। কি সেই পচা কাজ, জানো?

শহরের মাঝামাঝি জায়গায় ছিল এক খাবারের দোকান। ছোটো পচা খাবারের দোকান লুট করল। ভেবেছিল, কেউ ওকে আটকাতে পারবে না।

ও আসলে ভুল ভেবেছিল।

ওকে আটকাতে এল কে?

বলো তো কে?

সতেরো.
কে আবার?

মাঝামাঝি চাচা!!

মাঝামাঝি চাচা ঠিকই ধরে ফেলল ছোটো পচাকে। এরপর বেঁধে ফেলল দড়ি দিয়ে।

পুলিশ এসে সহজেই ধরে নিয়ে গেল ওকে।

মাঝামাঝি চাচা বলল, চাইলেই ভালো কাজ করা যায়।

আঠারো.
আসলে, চাইলেই ভালো কাজ করা যায়।

উনিশ.
সেই থেকে মাঝামাঝি চাচার নাম ছড়িয়ে পড়ল।

মাঝামাঝি চাচা সব সময় ভালো কাজ করত।

তাই আবারো তার নাম হয়ে গেল ভালো চাচা।

বিশ.
ভালো চাচা সব সময় কি বলত, বলো তো?

চাইলেই ভালো কাজ করা যায়! ■

শিশু সাহিত্যিক ও সাবেক সম্পাদক, মাসিক নবারুণ

বই মেলায়

লাড্ডু গুড্ডুর

কাণ্ড কীর্তি

লেখা: সত্যজিৎ বিশ্বাস

আঁকা: মানিক বর্মন

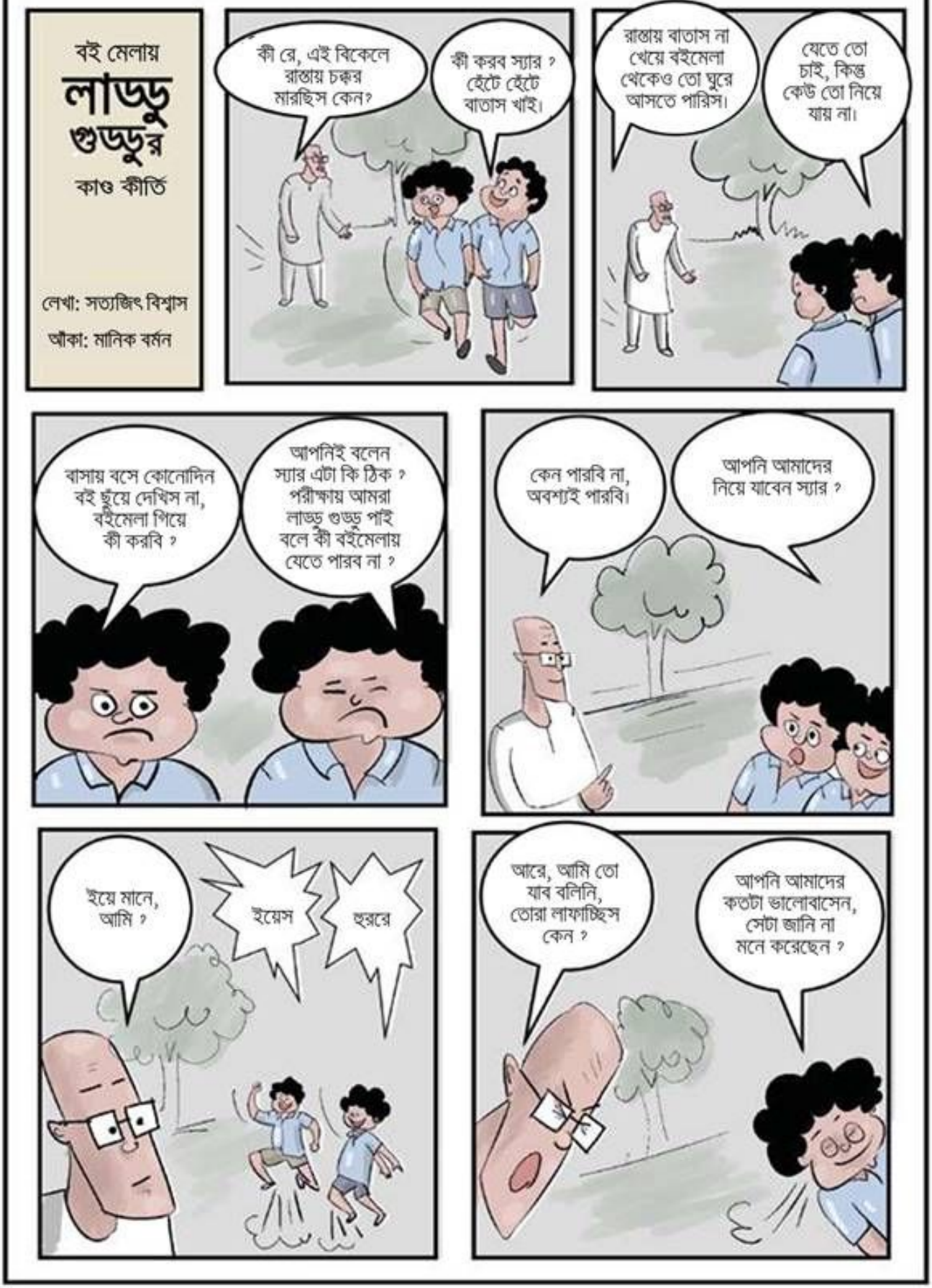

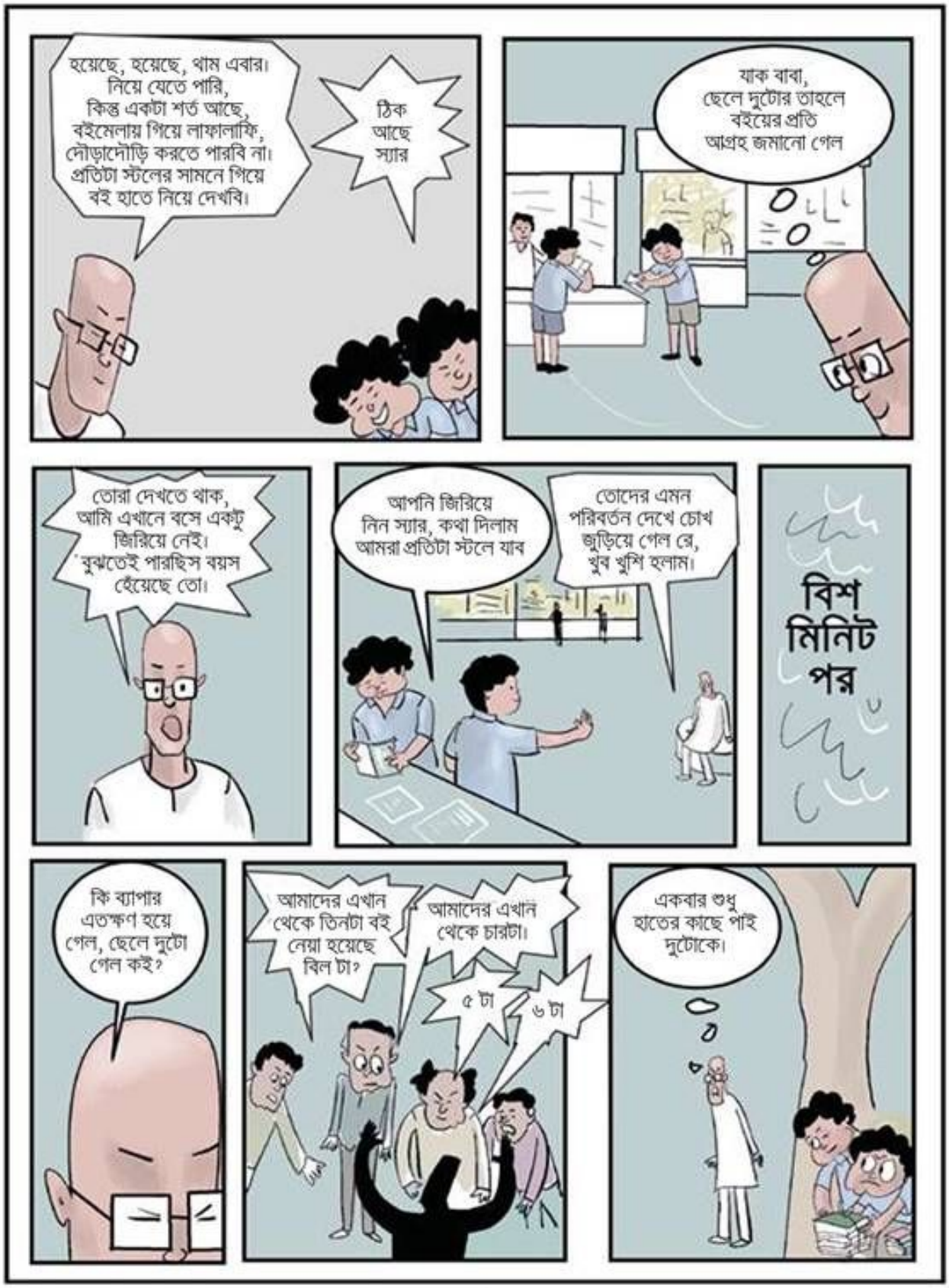

কার্টুনিস্ট ও সাংবাদিক, কিশোর বাংলা

তাঁরা মৃত্যুহীন

আবু তৈয়ব মুছা

পিচ কালো রাজপথ
রক্তে– ভিজে লাল
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
উনিশশো বায়ান্ন সাল।

প্রাণ দিয়ে রফিকেরা
এনে দেয় ভাষা,
রক্তে- পূরণ হয়
বাঙালির আশা।

ভাষা নয় ধার করা
বীর-রক্তে কেনা,
কে পারে শোধিতে ঋণ ?
শহিদের দেনা।

শোনো তাঁরা মৃত্যুহীন
কারা তাদের তুল,
ভক্তি মেশা স্মরণীয়
দাও-ঐ চরণে ফুল।

আটই ফাগুন

জাহেদুল ইসলাম

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙা
এল আটই ফাগুন,
ছেলে হারা মায়ের বুকে
জ্বলল ঘৃণার আগুন।
ঘৃণার আগুন কেন জ্বলে
তোমরা কি কেউ জানো?
মায়ের মুখের ভাষার জন্য
ছেলে দিলো প্রাণও।
সেদিন হতে বাংলা মা যে
আজও ছেলে হারা,
মায়ের বুকের মানিক এখন
নীল আকাশের তারা।
ফাগুন কেন আগুন ঝরা
তোমরা এবার বুঝলে?
মায়ের চোখে পলাশ ফুটে
পাবে তোমরা খুঁজলে।

বাংলা ভাষার গান

গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন

আমার ভাষা বাংলা ভাষা
মধুর চেয়েও মিষ্টি
আমার মনে শান্তি সুখের
ঝরায় শুধু বিষ্টি।

কী যেন এক জাদু জানে
বাংলা মায়ের কথা
ধ্যানী মুনীর ধ্যান ভেঙে দেয়
ভাঙে নীরবতা
কাড়তে পারে এক পলকে
সবার চোখের দৃষ্টি।

সকল ভাষার সেরা ও ভাই
বাংলা মায়ের ভাষা
মিটিয়ে দেয় প্রাণের ক্ষুধা
পুরায় মনের আশা
বিশ্ব মাঝে বাংলা ভাষা
অপূর্ব এক সৃষ্টি।

ভাষা প্রেমিক লেখক কবি
এই ভাষারই ছন্দে
রচে অমর কাব্য গাথা
সৃষ্টির মহানন্দে
বিশ্বে গর্বে বেঁচে আছে
বাঙালিদের কৃষ্টি।

একুশ আমার অহংকার

মো. আকিব হোসেন

রক্তস্নাত ফেব্রুয়ারি আবার ফিরে এল
ভাষা আন্দোলনের উত্তাল স্মৃতি মনে পড়ে গেল
স্মৃতিমাখা এ মাস মনের গহীনে জমায় ভিড়
বুকের তাজা রক্ত পাক-শাসকের মনে ধরিয়েছিল চিড়।
সালাম রফিক বরকত জব্বার সবাই আমার ভাই
তাদের আত্মা শান্তি পায় বাংলায় যদি গাই
স্বাধীন দেশ স্বাধীন মানুষ স্বাধীন আমার মন
স্মৃতির পাতায় লিখে রেখেছি উনিশ বায়ান্ন সন।
বাংলা আমার মায়ের ভাষা বাংলায় করি প্রার্থনা
বাংলা সংস্কৃতি বিহনে স্বাধীনতাই ছলনা
বাঙালি জাতি যা দিতে পারে সাধ্যি আছে কার
একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের শ্রেষ্ঠ উপহার।

অনার্স ৩য় বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

নেতা

সোয়ানুল ইসলাম

বঙ্গবন্ধুকে জানাই মোরা
অসীম শ্রদ্ধা ও সালাম
তাঁর অবদানেই মোরা
সোনার বাংলা পেলাম।

স্বাধীনতার মহান নেতা
আছেন বাংলার প্রতিটি ঘরে
থাকবেন তিনি আজীবন
বাঙালির অন্তরে অন্তরে।

৭ম শ্রেণি, কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা

আত্মদান

নীতু ইসলাম

আত্মদানের স্মৃতি নিয়ে
আসে একুশে ফেব্রুয়ারি
এ দিনে তাদের আমরা
শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি।
জীবন বিলিয়ে ছিনিয়ে আনে
প্রাণের বাংলা ভাষা
এ ভাষাতেই কথা বলে
জুড়ায় মনের আশা।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, মুগদা শাখা, ঢাকা

আমার ভাষা

আরিয়ান আয্ওয়াত (রোহিত)

ভাষা আমার ভাষা–
আমার বাংলা ভাষা,
ভাষা আমার ভাষা–
আমার ভালোবাসা।

আমার ভাষায় শহিদ রক্তের
ভাসিয়ে গেছে বান,
আমার ভাষার জন্য তাঁরা
দিয়ে গেছে প্রাণ।

আমার ভাষায় আসলে আঘাত
কেউ তা মানবে না,
তাহলে যে কষ্ট পাবে
ভাষা শহিদদের মা।

দশম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

ভাষা নিয়ে যুদ্ধ

শেহ্‌জাদী ফারহা অর্থি

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। তখন আমাদের দেশে অনেক বড়ো একটা যুদ্ধ হয়েছিল। ভাষা নিয়ে যুদ্ধ।

পৃথিবীতে এরকম যুদ্ধ এর আগে কখনো হয়নি। তখন ছিল ১৯৫২ সাল।

দেশ নিয়ে যুদ্ধ হয়। ভাষা নিয়ে যুদ্ধ আবার কি করে হয়? আমরা যে ভাষায় কথা বলি তা বাংলা ভাষা।

সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা বাধা দেয়- বাংলা ভাষায় কথা বলা যাবে না। কথা বলতে হবে কঠিন উর্দু ভাষায়।

বাবা-মা, ফুফি, দাদি, নানু মণিরা মজা করে শিশুদের বাংলায় গল্প শুনাতে পারবে না। এটা কী করে হয়?

তারপর আমাদের দেশের মানুষ মানলই না তাদের কথা। কেউ কী মানে এসব কথা! আমিও মানি না।

সহজ মিষ্টি বাংলা ভাষা রেখে কী কেউ কঠিন উর্দু ভাষায় কথা বলে?

একদিন সবাই মিছিল করতে নেমে পড়ল রাজপথে। তখন ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের একুশ তারিখ।

সবাই স্লোগান দিতে লাগল–'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। উর্দু ভাষা মানি না'।

মিছিল দেখে পাকিস্তানিরা গেল খুব রেগে। তারা গুলি করল মিছিলে। শহিদ হলেন– রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ। আরো নাম না জানা অনেকে। পাকিস্তানিরা ভয় পেয়ে আমাদের ভাষাই মেনে নিল শেষে। সেই থেকে বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা।■

দ্বিতীয় শ্রেণি, আনোয়ারা মান্নাফ গার্লস স্কুল, ঢাকা

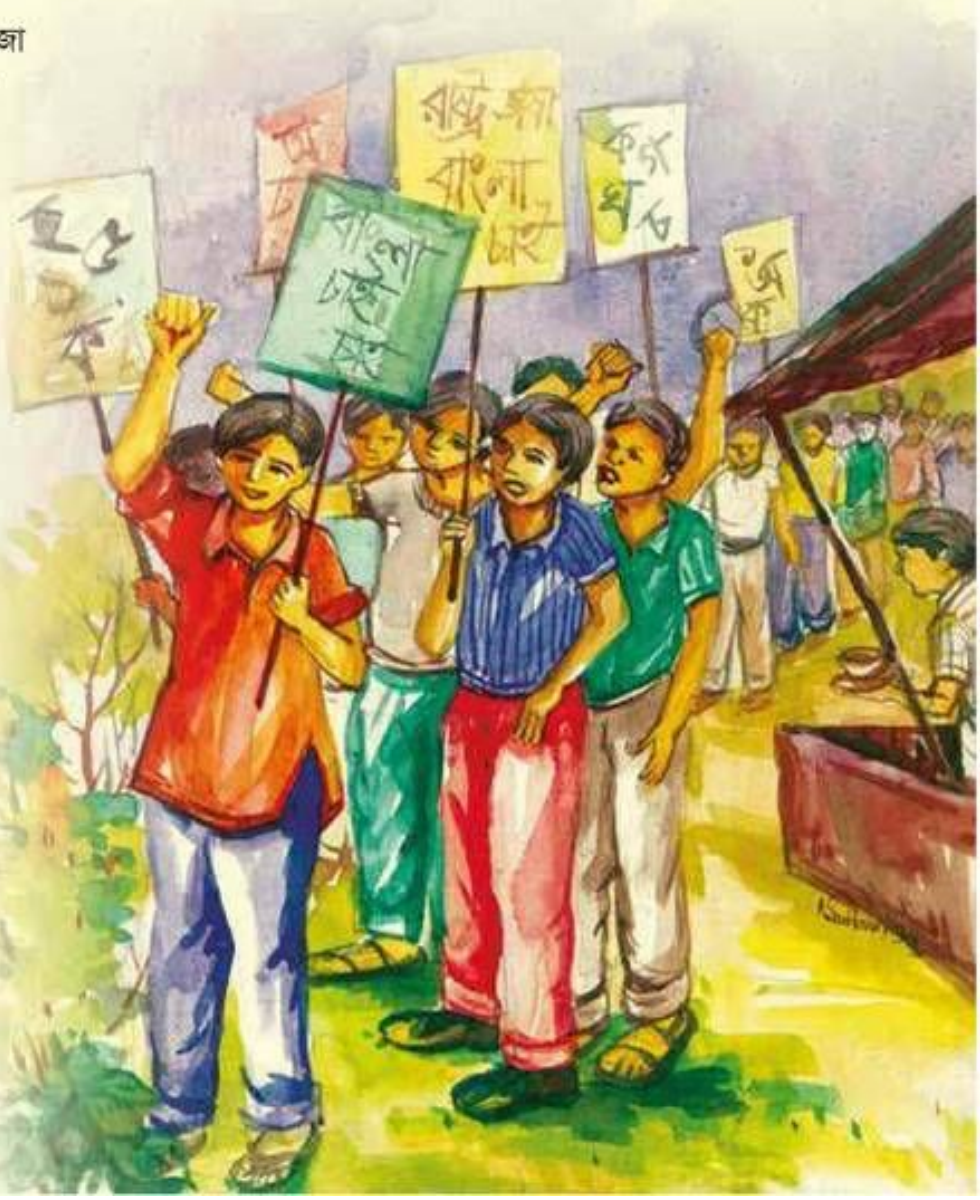

ঐতিহ্যের ঘোড়ার গাড়ি

মো. জাহেদুল ইসলাম

আদি ঢাকাইয়াদের ঐতিহ্যবাহী বাহন হলো ঘোড়ার গাড়ি। যার প্রচলন শুরু হয় ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনামলে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় ও কালের বিবর্তনে প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী বাহন ঘোড়ার গাড়ি যা টমটম গাড়ি নামেও পরিচিত। ঘোড়ার গাড়ি যে শুধু ঢাকার রাজকীয় ঐতিহ্য ঘিরে আছে তা নয়, রূপকথার গল্পতেও উল্লেখ আছে এর কথা। একসময়ে এই গাড়িটি ছিল জমিদার, রাজা-বাদশা এবং রাজ পরিবারের সদস্যদের পরিবহনের প্রধান বাহন এবং রণাঙ্গনের রসদ সরবরাহের অন্যতম মাধ্যম।

ব্রিটিশ শাসনের সময়ে এই ঘোড়ার গাড়ি ঢাকা শহরে চলাচলের সুবিধার্থে প্রথমে ইট-সুরকি, সিমেন্ট-বালু পরবর্তীতে পিচঢালা ইট দিয়ে রাস্তা সংস্কারের কাজ করা হয়েছিল। সর্বপ্রথম ঘোড়ার গাড়ির ব্যবহার ইংরেজরা শুরু করলেও স্থানীয় অভিজাত শ্রেণির মানুষেরাও এই সুবিধা নেন। একসময় তা চলে আসে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

অতীতে রাজা-বাদশা, আমির-ওমরাহ ও জমিদাররা ঘোড়ার গাড়িকেই যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করতেন। ঘোড়ার গাড়ি ছিল রণাঙ্গনের রসদ সরবরাহেরও প্রধান বাহন। এখন অবশ্য রাস্তায় মোটরচালিত বাহন থাকায় আর সেভাবে ঘোড়ার গাড়ি দেখা যায় না। মানুষের প্রয়োজনের বিবর্তনে বিলুপ্তির দ্বার প্রান্তে পৌঁছেছে এই ঐতিহ্যবাহী বাহনটি। ১৮৩০ সালে ঢাকায় যখন সর্বপ্রথম ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন শুরু হয় তখন এ দেশে চলে নবাবী শাসন।

বর্তমানে ঢাকা শহরে অল্প কিছু গাড়ি চলাচল করতে দেখা যায়। সদরঘাট, ফুলবাড়িয়া গুলিস্তান, গোলাপশাহ মাজার, বঙ্গবাজার, বকশীবাজার ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় গাড়িগুলো চলাচল করে। একটি

ঘোড়ার গাড়িতে ১২-১৪ জন যাত্রী বসতে পারে। যাত্রী পরিবহন ছাড়াও ঘোড়ার গাড়ি পুরান ঢাকার বিভিন্ন উৎসব, বিয়ে, জন্মদিন, চলচ্চিত্রের সুটিং ও র‍্যালিতে ব্যবহার করা হয়। তবে অনেকে শখের বশে ঘোড়ার গাড়িতে চড়েন। নানা অনুষ্ঠানে ঘোড়ার গাড়িকে ফুল দিয়ে সুসজ্জিত করে সাজানো হয়। কোচোয়ান ও হেলপারের জন্যও রয়েছে বিশেষ পোশাক।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো এই ঘোড়া গাড়ি। যা শত বছর পার করে দিয়ে যাত্রীদের আজও রাজা-বাদশাদের ভ্রমণের আবহ উপভোগ করার সুযোগ করে দেয়। তাই তো আজও শত যান্ত্রিক আর দ্রুতগামী যানের সঙ্গে টিকে থাকার লড়াইয়ে আছে রাজা-জমিদারের সেই বাহন। মানুষ আজও নতুন প্রজন্মকে ঢাকার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ছুটে আসেন ঘোড়া গাড়ির কাছে। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এই ঘোড়া গাড়িকে দেখা হয় আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৮৩০ সালে ঢাকায় সর্বপ্রথম ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন শুরু হয়। তখন আর্মেনীয়রা ছিল এদেশের জমিদার। তাদের বসবাস ছিল পুরান ঢাকায়। ব্যবসার উদ্দেশ্যে তারা সে সময় ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় দোকান খুলেছিল। তার মধ্যে শাঁখারি বাজারের 'সিরকো অ্যান্ড সন্স' অন্যতম। এ দোকানে বিভিন্ন ইউরোপীয় জিনিসপত্র বিক্রি হতো। ১৮৫৬ সালে সিরকোই প্রথম ঢাকায় ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন করেন যা তখন ঠিকা গাড়ি নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে তা অন্যতম প্রধান যানবাহনে পরিণত হয়। আগেকার দিনে দেশের বড়ো শহর থেকে মফস্বল শহরের জমিদার ও অভিজাত শ্রেণির মানুষজন ঘোড়ার গাড়িকে প্রধান বাহন হিসেবে ব্যবহার করত। প্রতিদিন পুরান ঢাকার রাস্তায় চলাচলের পাশাপাশি এই গাড়িগুলো ঈদ, পয়লা বৈশাখ, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে আজও কদর পায় ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার গাড়ি।■

প্রাবন্ধিক

তাশদিদ তাবাসুম আশফিয়া, চতুর্থ শ্রেণি, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

বই দিয়ে কলেজের গেট

আরিয়ান খান

স্কুল-কলেজের চমৎকার ও নান্দনিক গেট নতুন কিছু নয়। কিন্তু যে গেটের দর্শন পেতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষজনের ছুটে আসে সেই গেটের স্বাভাবিক নয়।

ঠিক তেমনই লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার দইখাওয়া আদর্শ কলেজের মূল গেট । এই গেটের নকশাটি কেবল নান্দনিকই নয়, একদম ব্যতিক্রমধর্মীও বটে। কারণ এই গেটটি আর কোনো কিছু নয়, তৈরি হয়েছে বইয়ের আদলে! শিক্ষা অর্জনের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে বই। মানুষের মাঝে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো পৌছাতে বইয়ের গুরুত্ব অপরিহার্য। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বই দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে উত্তরের সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার দইখাওয়া আদর্শ কলেজের মূল গেট। বই পড়লে পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় চলে আসে এই ধারণা থেকেই নির্মাণ করা হয় গেটের মূল ফটকটি।

যেহেতু গেটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, তাই এর প্রবেশমুখ থেকেই যেন তার ছোঁয়া পাওয়া যায়, সেই চিন্তা থেকেই বইয়ের নকশায় তৈরি করা হয়েছে এই গেট। হাতীবান্ধা-চাপারহাট অঞ্চলিক সড়কের পাশেই অবস্থিত দইখাওয়া আদর্শ কলেজ। আর এই কলেজে ঢোকার মুখেই রয়েছে বইয়ের আদলে গড়ে তোলা মূল ফটক। সাহিত্যানুরাগীদের জন্য এই গেটটি যেন বিশেষ কিছু। কেননা, দেশি-বিদেশি কবি-সাহিত্যিকদের ৫০টিরও বেশি বই যেন এই গেটের দুই স্তম্ভ গড়ে তুলেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেলজয়ী কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি, বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অমর কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা থেকে শুরু করে মহাকবি কায়কোবাদের মহাশ্মশান, মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত, ডা. লুৎফর রহমানের মহৎ জীবন, সৈয়দ শামসুল হকের

নুরুলদীনের সব সারাজীবন, হুমায়ূন আহমেদের শঙ্খনীল কারাগার এমন সব সাহিত্যরত্নের কী নেই এই গেটে। আবার গেটের ওপরে রয়েছে একটি গ্লোব, যেখানে বিভিন্ন দেশের পতাকা অঙ্কিত রয়েছে। ভাবনাটা এমন ছিল, বই যেহেতু জ্ঞানের ভাণ্ডার, তাই বইয়ের প্রতিনিধিত্ব থাকবে গেটে। এখানে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের অনেক বইকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে জ্ঞানচর্চা প্রয়োজন, সেটি যেন কলেজে প্রবেশের আগেই বুঝিয়ে দেয় এই গেট। ১৯৯৯ সালে হাতীবান্ধা দইখাওয়া আদর্শ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সময় থেকেই এর একটি মূল গেট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। অধ্যক্ষ এক পর্যায়ে এরকম একটি গেট নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। কীভাবে সেটি হতে পারে, সে বিষয়েও তারা ভিন্নধর্মী সিদ্ধান্ত নেন। ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের সাবেক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন শিক্ষকরা। কীভাবে গেটটিকে একদম আলাদা করে গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে তাদের মাধ্যমে চারুকলার শিক্ষার্থীদের সহায়তা চান। আর এভাবেই বইয়ের আদলে গেটটির একটি নকশা চূড়ান্ত হয়। প্রথমে কলেজের তহবিল থেকে বরাদ্দ দিয়ে নির্মাণ কাজ শুরু করেন। সহায়তা আসে আরো অনেক জায়গা থেকেই। শেষ পর্যন্ত এক বছরের প্রচেষ্টায় ব্যতিক্রমধর্মী এই গেটটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়। তা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সবার। লক্ষ্য ছিল বই নিয়ে মানুষের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা। এখন মনে হচ্ছে আমাদের সেই লক্ষ্য সফল হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন এক শহিদমিনার। এই শহিদমিনারের স্তম্ভগুলোর আর দশটি জাতীয় শহিদ মিনারের মতো হলেও এর পেছনের অংশটি একটু আলাদা। স্তম্ভগুলোর পেছনে গোটা শহিদমিনারকে যেন আঁকড়ে ধরে রেখেছ একটি বই, যেখানে রয়েছে বর্ণমালা, আর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন সময়কার গল্পগাথা। কলেজটির ভিতরে সবুজে ঘেরা সাজানো সারি সারি গাছ যেন শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।■

প্রাবন্ধিক

সাজেদা আক্তার, অষ্টম শ্রেণি
মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ঢাকা

দৃষ্টিনন্দন শহিদমিনার

ফেব্রুয়ারি মাস, ভাষার মাস, মহান আত্মত্যাগের স্মৃতির মাস এবং একই সঙ্গে গৌরব ও সাহসের স্মারক বহনকারী মাস। মহান ভাষা শহিদদের স্মৃতি রোমন্থন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা মনে হলেই ভেসে ওঠে শহিদমিনারের প্রতিকৃতি। এইদিনে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে জানাতে ছুটে যাই ফুল হাতে শহিদমিনারে। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষেরা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদদের সম্মানে গড়ে তোলে শহিদমিনার। তেমনি একটি শহিদমিনার হলো সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শহিদমিনার। দেখতে খুবই সুন্দর। ইতোমধ্যে সবার নজর কেড়েছে। এটি নতুন ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সায়েন্স অনুষদ এবং কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের মাঝে টিলার উপর লেক ঘেঁষে তৈরি করা হয় এই শহিদমিনার। এর নকশা করেছেন স্থপতি রাজন দাশ শহিদ। তিনি লিডিং ইউনিভার্সিটির স্থাপত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। নাম দিয়েছেন সূর্যালোকে বর্ণমালা।

সকালে সূর্যালোকে মিনারটি ছায়াচ্ছন্ন অস্পষ্ট থাকে এবং সূর্যের দিন পরিক্রমায় ক্রমশ সে আলোকিত ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাই এই মিনারের শিরোনাম সূর্যালোকে বর্ণমালা। সত্যিই যেন বর্ণমালারা রোদ পোহায় এই শহিদ মিনারে। শক্ত মেরুদণ্ডে ভাষা শহিদের বর্ণ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখানে। এটির কিছু বর্ণমালা দূর থেকে খুব স্পষ্ট। কাছে আসলে কুঠুরিতে আরো ছোটো ছোটো বর্ণের সমাহার। জাতীয় দিবস উদযাপন ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনুষ্ঠান এ শহিদমিনারে অনুষ্ঠিত হয়। নানা স্থান থেকে মানুষ এ শহিদমিনারটি দেখতে ক্যাম্পাসে আসেন।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

চার বছরে ২০ পদক

নবারুণের বন্ধুরা, তোমাদেরকে আজ শোনাব এমন এক বিজয়ী কন্যার কথা যার ঝুলিতে ইতোমধ্যে জমা পড়েছে তার বয়সের চেয়েও অনেক বেশি পদক। মাত্র আট বছর বয়সেই সে অর্জন করে নিয়েছে ২০ টি পদক। হ্যাঁ বন্ধুরা, বলছিলাম তায়কোয়ান্দোতে রেড ও ব্ল্যাক বেল্ট প্রাপ্ত জাফরিন রহমানের কথা।

যে বয়সে কার্টুন দেখা, খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা, সে বয়সেই জাফরিন চষে বেড়াচ্ছে তায়কোয়ান্দোর মাঠ। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে একে একে জিতে নিচ্ছে পদক। পূর্ণ হচ্ছে তার ঝুলি। তার ঝুলিতে জমানো ২০ টি পদকের মধ্যে রয়েছে দুইটি সোনা, একটি রোপা ও ১৭টি ব্রোঞ্জপদক।

মাত্র চার বছর বয়সে আত্মরক্ষার কৌশল শিখতে জাফরিন রহমান ভর্তি হয়েছিল তায়কোয়ান্দোতে। পরিচ্ছন্ন বিনোদন ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে যে শিশু বেড়ে ওঠে, তার পক্ষে সফল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা সম্ভব। শিশু বয়সে মানুষ যা গ্রহণ করে পরবর্তী জীবনে সে তা লালন করে – এই ধারণা থেকে জাফরিনকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার তাগিদে মা আফরিনা হায়দার তাকে ভর্তি করে দেন তায়কোয়ান্দোতে। কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে পরের চার বছর সে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে সেরা হতে থাকে। একে একে আসতে থাকে মেডেল। কোনোটা সোনার, কোনোটা রুপার আর কোনোটা বা ব্রোঞ্জ। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত পদক সংখ্যা ২০। তার এই সফলতার কারণ কি জানো বন্ধুরা, অধ্যবসায়, কঠোর অধ্যবসায়। মিরপুর ডিওএইচএসের তায়কোয়ান্দো ফেডারেশনে প্রতিদিন তিন ঘণ্টা অনুশীলন করে সে। কখনোই কোনো অজুহাতে বাদ যায়নি ক্লাস। ঝড়-বৃষ্টি যাই হোক ক্লাস বা অনুশীলন কোনোটাই মিস করে না জাফরিন। করোনাকালীন সময়েও অনলাইনে অনুশীলন করেছে সে। জাফরিন রহমান মিরপুর বনফুল আদিবাসী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। পড়ালেখা ছাড়া নাচ-গানের পাশাপাশি তার সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় হচ্ছে তায়কোয়ান্দো। ■

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

শিক্ষার্থীদের জন্য ইউনিক আইডি

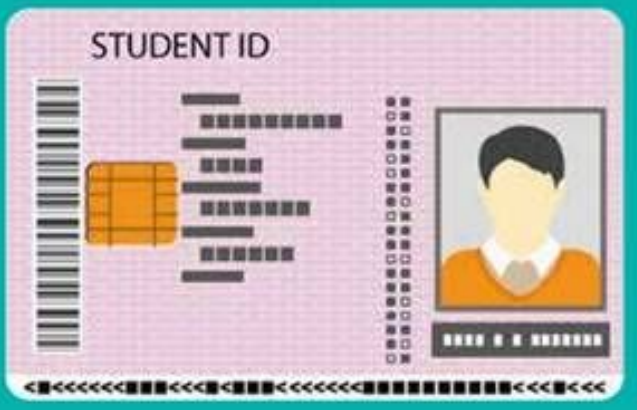

অভিন্ন পরিচয়পত্র বা ইউনিক আইডি। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য অভিন্ন এ পরিচয়পত্র তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এখনো চলছে এর কার্যক্রম। প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, প্রতিটি শিক্ষার্থীর মৌলিক ও শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় তথ্য এক জায়গায় রাখার জন্য এ আইডি তৈরি করা হচ্ছে। অফিস অফ রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয় বর্তমানে কোনো শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্মনিবন্ধন সম্পন্ন করছে। আর যারা ১৮ বছরের ওপরে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) আছে। এই দুই স্তরে পরিচয় ও শনাক্তের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাদ যাচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে। এদের আইডেন্টিফিকেশনের আওতায় আনার জন্যই ইউনিক আইডি তৈরি করা হচ্ছে।

একজন শিক্ষার্থীর সমস্ত প্রকার সেবা যেমন বই নেয়া থেকে শুরু করে ফল প্রকাশ, রেজিস্ট্রেশন, বৃত্তি, উপবৃত্তির অর্থ নেয়া অর্থাৎ যত ধরনের নাগরিক সেবা আছে সবই দেয়া হবে এই আইডির মাধ্যমে। আর যখন শিক্ষার্থীর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে তখন নির্বাচন কমিশন সচিবালয় তাদের ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়ে এই ইউনিক আইডিই জাতীয় পরিচয়পত্রে রূপান্তর করবে।

স্ট্যাবলিশমেন্ট অফ ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইইআইএমএস) প্রকল্পের আওতায় তৈরি করা চার পৃষ্ঠার ফরমে শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ফরমে শিক্ষার্থীর নাম, জন্মনিবন্ধন নম্বর, জন্মস্থান, জেন্ডার, জাতীয়তা, ধর্ম, অধ্যয়নরত শ্রেণি, রোল নম্বর, বৈবাহিক অবস্থা, প্রতিবন্ধিতা (ডিজঅ্যাবিলিটি), রক্তের গ্রুপ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কি না, মা-বাবার নামসহ বেশ কিছু তথ্য ঘর রয়েছে। এছাড়াও ইউনিক আইডির ফরমে যেসব তথ্য শিক্ষার্থীরা দিচ্ছেন তা যেন কোনো ভাবেই অন্যের হাতে না যায় তা নিশ্চিত করেন বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ■

প্রতিবেদন : আরিফুল ইসলাম

অদম্য তামান্না

জন্ম থেকেই দুটি হাত, একটি পা নেই তামান্না নূরার। এবার এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছেন। পা দিয়ে লিখে পরীক্ষায় টানা চতুর্থবার জিপিএ-৫ পাওয়া অদম্য তামান্না আক্তার নূরার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। গত ২৪শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাসহ দুটি স্বপ্নের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বরাবর চিঠি লিখেছিলেন তামান্না। সেই চিঠির প্রেক্ষিতে ১৪ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ও বিকেলে পৃথক দুটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে কল দিয়ে তামান্নাকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। একই সঙ্গে তামান্নার স্বপ্নপূরণে সব সহযোগিতার আশ্বাস দেন। হঠাৎ হোয়াটসঅ্যাপে ফোন রিসিভ করতেই তামান্নার ফোনের ওপাশ থেকে এক নারী বলে উঠলেন, আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছিলাম। আমি কি তামান্নার সঙ্গে কথা বলছি? ফোনের ওপাশের কণ্ঠস্বর শুনে তামান্নার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। মুখে আর কথা বলতে পারছিলেন না। আবেগের চাপ সামলাতে না পেরে কেঁদেই ফেললেন তামান্না। একপর্যায়ে কান্না থামাতে বললেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হা সিনা। কান্না থামিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সালাম দেন তামান্না। স্বপ্ন পূরণে প্রধানমন্ত্রী তামান্নাকে "বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টে" একটা আবেদন করার পরামর্শ দেন। ওই ট্রাস্টের মাধ্যমে তাকে সব সহযোগিতা দেবেন বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তামান্নার সঙ্গে টানা চার মিনিটের কথোপোকথনে প্রধানমন্ত্রী তামান্নাকে সাহস হারাতে নিষেধ করেন। সাহস আর মনোবল থাকলে তামান্না অন্য উচ্চতায় পৌছাতে পারবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

এর আগে বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে তামান্নার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফোন দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা। ফোন রিসিভ করতেই তামান্নার ফোনের ওপাশের নারী বলেন, আমি লন্ডন থেকে শেখ রেহানা বলছি। আমি কি তামান্না নূরার সঙ্গে কথা বলছি? তখন কান্না করতে থাকেন তামান্না। কান্না থামাতে বলে শেখ রেহানা বলেন, কেঁদো না। টানা ভালো রেজাল্ট করায় তোমাকে অভিনন্দন। তোমার সংগ্রামের কথা শুনেছি। তুমি খুব সাহসী। তুমি এগিয়ে যাও। আমরা দুই বোন বেঁচে থাকা পর্যন্ত তোমার সহযোগিতা করে যাব। যারা সাহস রেখে চলে তাঁরা কখনো হেরে যায় না। শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণিও ফোন করে তামান্নার খোঁজ-খবর নিয়েছে এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেইসাথে তামান্নার সাথে দেখা করার আশ্বাসও দিয়েছেন।

তিন ভাই-বোনের মধ্যে বড় তামান্না নূরা যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার বাঁকড়া ডিগ্রি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। প্রকাশিত ফলাফলে পিইসি, জেএসসি ও এসএসসির মতো এইচএসসিতেও জিপিএ-৫ পেয়েছে । বাবা রওশন আলী ঝিকরগাছা উপজেলার ছোট পোদাউলিয়া মহিলা দাখিল মাদরাসার) শিক্ষক। মা খাদিজা পারভীন গৃহিণী। ■

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

দ-শ-দি-গ-ন্ত

আলো ছড়াচ্ছে 'জয় বাংলা পাঠাগার'

টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার খামারপাড়া গ্রামে জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছে 'জয় বাংলা পাঠাগার'। পাঠাগারে স্থান পেয়েছে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই। বই বাড়িতে নিয়ে পড়ার সুযোগও পাচ্ছেন পাঠকেরা। এতে শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় বাসিন্দারা খুশিও। খামারপাড়া গ্রামের কৃতি সন্তান যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিজ্ঞানী একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী এবং তার স্ত্রী জিনাত নবী এই পাঠাগারটি স্থাপন করেছেন। ১৬ই ডিসেম্বর ২০২১ আনুষ্ঠানিকভাবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই পাঠাগারের উদ্‌বোধন করেন তারা। উদ্‌বোধনের পর থেকেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে পাঠাগারটি।

জয় বাংলা পাঠাগারের আলমারিতে সাজানো রয়েছে সারি সারি বই। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা পাঠাগারে বসে বই পড়ছেন। বই পড়ার পাশাপাশি অনেকে খবরের কাগজও পড়ছেন। শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়,গ্রামের অনেক শিক্ষিত তরুণ, যুবক ও বয়স্ক মানুষ বই পড়তে আসেন। প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ জনের বেশি মানুষ আসেন এখানে। মনোরম ও দৃষ্টিনন্দন এ পাঠাগারে বর্তমানে ৩১৫টি বই রয়েছে। পাঠাগারটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে বেশ কিছু বই সংরক্ষিত রয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিকের জীবনী, বৈজ্ঞানিক কাহিনি ও রূপচর্চার বইও রয়েছে। রয়েছে ছোটোদের গল্পের বই। বইয়ের পাশাপাশি টাঙ্গাইলের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি দিয়ে পাঠাগারটি সাজানো হয়েছে।

গাড়ি চালাবে মাছ

মাছ চালাবে গাড়ি! কি অবিশ্বাস্য একটি খবর, তাই-না বন্ধুরা? তবে ঘটনাটি সত্যি। আগামীতে গোল্ড ফিশ চালাবে গাড়ি। ইসরাইলের একদল বিজ্ঞানী মাছ দিয়ে গাড়ি চালানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশটির বেন গুরিওন ভার্সিটির এ গবেষক দল ইতোমধ্যে এফওভি নামে মাছচালিত একটি যান উদ্ভাবন করেছে। রোবোটিক গাড়িতে রয়েছে রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি, যা লেজার লাইট ব্যবহার করে গাড়ির অবস্থান এবং পানির ট্যাঙ্কির নিচে মাছের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারে। কম্পিউটার, ক্যামেরা, ইলেক্ট্রিক মোটর ও বিশেষ ধরনের চাকার সাহায্যে মাছ পানির ট্যাঙ্কের ভেতর বসেই ওই যানের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে।

জানা যায়, আশ্চর্যজনকভাবে গাড়ি চালানো শিখতে মাছের খুব বেশি সময় লাগে না। প্রথমে তারা কিছুটা দ্বিধান্বিত থাকে। তারা বুঝতে পারে না যে, আসলে কী হচ্ছে। কিন্তু দ্রুতই বুঝতে পারে, তারা যে যন্ত্রটার ওপর আছে, তার সঙ্গে তাদের নড়াচড়ার সম্পর্ক আছে। গবেষণার অংশ হিসেবে ছয়টি গোল্ড ফিশের প্রত্যেকেই অন্তত ১০টি করে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিয়েছে। প্রত্যেকবার তারা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেছে। এরপর তাদের পুরস্কার হিসেবে দেয়া হয়েছে খাবার। কয়েকটি গোল্ডফিশ অন্যদের চেয়ে ভাল গাড়ি চালিয়েছে। কোনো কোনো মাছ দারুণ গাড়ি চালিয়েছে। কোনো মাছ মধ্যম মানের। গবেষক দলের প্রধান শাচার গিভন বলেন, আমরা মাছকে সেকেলে মনে করি। কিন্তু সেটা সত্যি নয়। মানুষ ছাড়াও অন্য অনেক দুর্দান্ত আর কৌশলী প্রাণী হচ্ছে মাছ।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দ ধাঁধা

পাশাপাশি: ১. অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান, ৩. নতুন, ৫. সতর্কতার সাথে, ৬. নামতার বই, ১০. নিষ্পত্তি, ১১. একটি আরবি মাস

উপর-নিচ: ১. বায়ান্ন, ২. নির্জন, ৪.ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহিদ, ৫. হাজার, ৭.বাংলাদেশের একটি বিভাগ, ৮.বস্ত্র, ৯. বদন

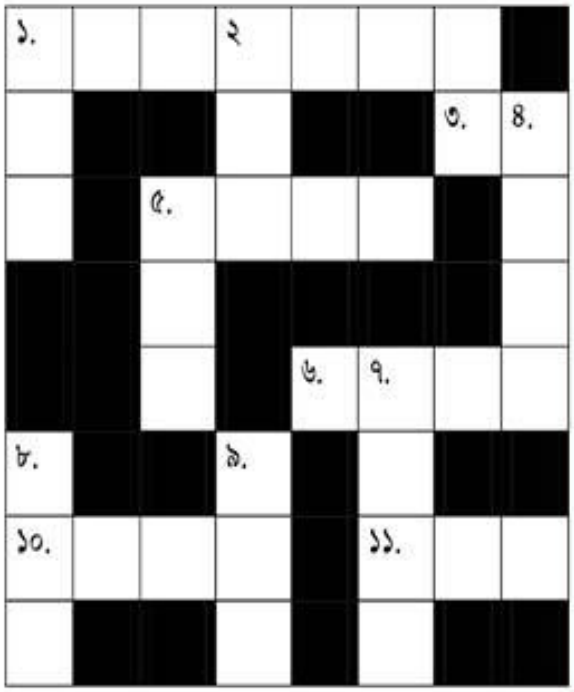

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হলো।

সংকেত: বন, ভাষা আন্দোলন, পাষাণ, নতজানু, টালমাটাল, যন্ত্রমানব, লব, বট, টক, কমল, মন, তরল, মহারাজা, হাট

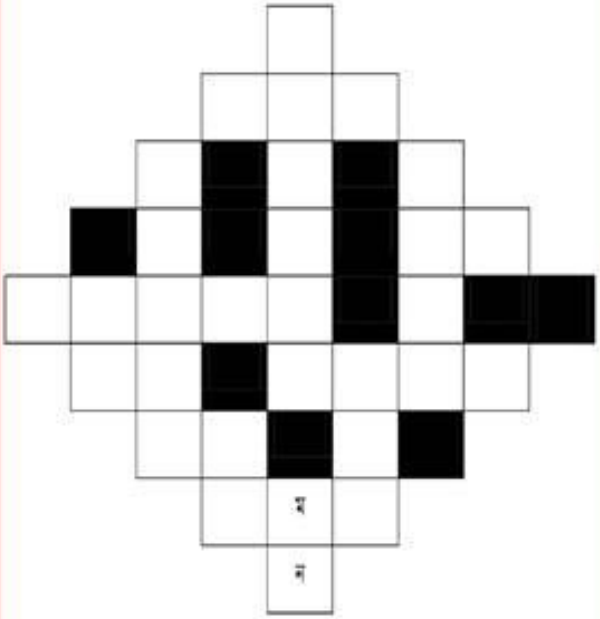

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৭৭		৮১		৬৯	৮		৬	১
	৭৯		৭১			১০		
৭৫		৭৩			১২		৪	৩
৬০			৬৩			১৬		১৮
	৫৮		৬৪		১৪		২০	
৫৪		৫৬		৪২	৩১			২২
	৫২		৪৪			২৯		
৫০		৪৬		৪০	৩৩		২৭	
	৪৮		৩৮			৩৫		২৫

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৫	*		-	৮	=	
*		*		/		-
	-	১	+		=	৫
-		-		+		+
৪	+		+	৩	=	
=		=		=		=
	*	১	+		=	১১

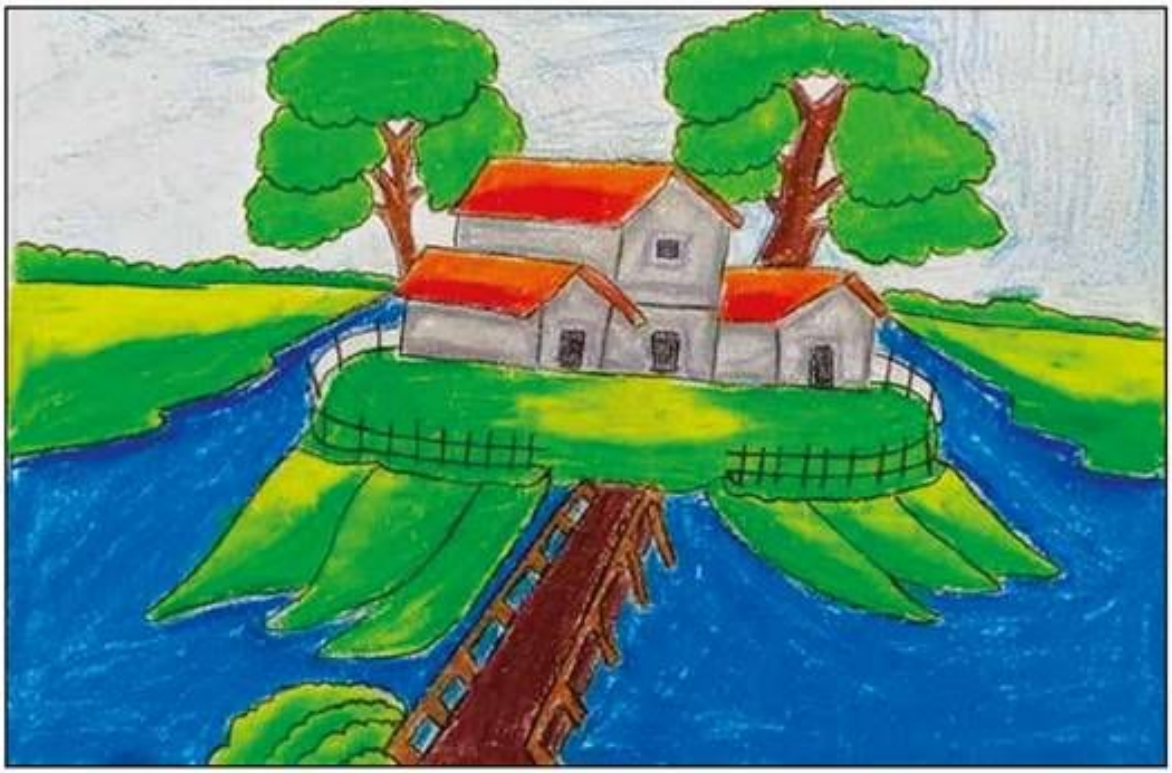

সাদিয়া হক, দ্বিতীয় শ্রেণি, খিলগাও সরকারি বিদ্যালয়, ঢাকা

সুজানা চৌধুরী স্নেহা, পঞ্চম শ্রেণি, ভিকারুন নেছা নূন স্কুল, ঢাকা

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্দেশনা

- শপিং মল ও বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা এবং হোটেল-রেস্তোরাঁসহ জনসমাগমস্থলে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরতে হবে।
- অফিস-আদালতসহ ঘরের বাইরে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়নে সারা দেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে।
- রেস্তোরাঁয় বসে খেতে ও আবাসিক হোটেলে থাকতে অবশ্যই করোনার টিকা সনদ প্রদর্শন করতে হবে।
- ১২ বছরের বেশি বয়সি সব শিক্ষার্থীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্ধারিত তারিখের পর টিকার সনদ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।
- স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরে স্ক্রিনিংয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। পোর্টগুলোতে ক্রুদের জাহাজের বাইরে আসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে। স্থলবন্দরগুলোতেও দেশের বাইরে থেকে আগত ট্রাকের সঙ্গে শুধু চালক থাকতে পারবেন। বিদেশগামীদের সঙ্গে আসা দর্শনার্থীদের বিমানবন্দরে প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।
- বিদেশ থেকে আসা যাত্রীসহ সবাইকে বাধ্যতামূলক কোভিড-১৯ টিকার সনদ প্রদর্শন করতে হবে।
- সর্বসাধারণের করোনার টিকা ও বুস্টার ডোজ গ্রহণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় প্রচার ও উদ্যোগ নেবে।
- পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সমাবেশ বন্ধ রাখতে হবে।
- স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন ও মাস্ক পরার বিষয়ে সব মসজিদে জুম্মার নামাজের খুতবায় ইমামরা সচেতন করবেন।
- কোনো এলাকার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে পারবে।

Regd. Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-46, No-08, February 2022, Tk-20.00

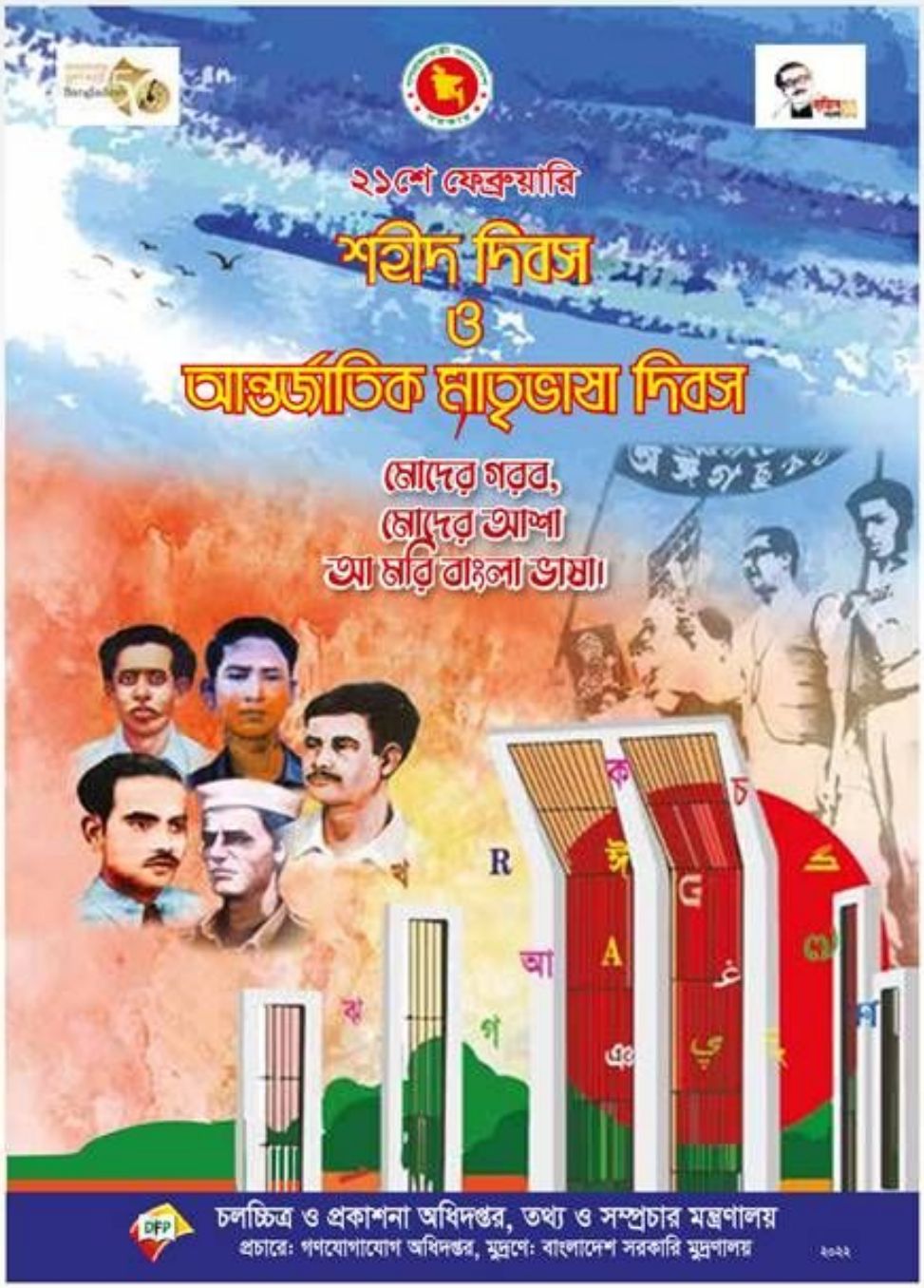

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা